রোগীদের পথনির্দেশিকা

রোগীদের পথনির্দেশিকা

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী

HASTALAR RİSALESİ BANGLADEŞ LİSANINA TERCÜMESİ

প্রকাশক

আলীম আল রাজী

লিবার্টি প্রকাশনী

রুম নং-৪, এইচ.এম. প্লাজা (ষষ্ঠ তলা)

সড়ক নং-০২, সেক্টর-০৩

উত্তরা, ঢাকা।

ISBN: 978-984-642-294-8

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০১৫

প্রথম সংস্করণ

স্বত্ব ॥ আলীম আল রাজী

প্রচ্ছদ ॥ খসরু

মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

S.DEMİREL BULVARI AYKOSAN SAN. SİT. 4'LÜ A BLOK NO:244 İKİTELLİ
BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL:0212 671 2547-48 (pbx) FAX: 0212 671 2549

PUBLISHED BY

Liberty Publications

Room No: 4, H. M. Plaza, Road: 02, Sector: 03, UTTARA - DHAKA

PRINTED BY

Jhingepul, 34 North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100 Room No: 4

www.sozler.com.tr
e-mail: risalanurbangla@gmail.com

রোগীদের পথনির্দেশিকা

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী

অনুবাদ

একাডেমী গ্রুপ

লিবার্টি প্রকাশনী

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচীপত্র

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালা-ই নুর/৭
পঁচিশটি প্রতিষেধক (পঁচিশতম লেমা) /১১
শিশু তাযিয়ানামা (১৭তম মাকতুবাত) /৪৩
হযরত আইয়ুব (আঃ) এর মুনাজাত /৪৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (রঃ) ও রিসালা-ই নূর

বদিউজ্জামান সাইদ নুরসী (রহঃ) ১৮৭৬ সালে পূর্ব তুরস্কের বিতলিস প্রদেশের নুরস্ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং অনেক সংক্রাম ও আত্মত্যাগের পথ মাড়িয়ে ৮৪ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে উরফায় ইন্তেকাল করেন।

তিনি অতি উচ্চ স্তরের আলিম ছিলেন যিনি প্রথাগত দ্বীনি বিষয় ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত ছিলেন। যৌবনেই তিনি শিক্ষা দীক্ষায় অসাধারন বুৎপত্তি লাভ করেন এবং বদিউজ্জামান (কারের বিস্ময়) খেতাব অর্জন করেন। বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর (রহঃ) জীবনকাল উসমানী খিলাফত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও বিভাজন, ১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র গঠন এবং এর পরের ৩৭ বছর পর্যন্ত ব্যপ্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (রহঃ) মানবতার জন্য ইসলামের পথে সংগ্রাম করে। তিনি অগনিত ছাত্রকে শিক্ষাদান এবং সমকালিন প্রথম সারির আলিমদের সংগে বিভিন্ন দ্বীনি কর্মকান্ডে জড়িত থাকা ছাড়াও পূর্ব তুরস্কে রুশ সৈন্যদের আক্রমন প্রতিরোদে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। রুশদের বিরুদ্ধে দুই বছর যুদ্ধে সক্রিয় থাকার পর যুদ্ধাহত অবস্থায় তিনি বন্দী হন। বন্দীত্ব থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তিলাভের পর ইসলামের স্বার্থ সমুন্নত করার জন্য জনজীবনে বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত

রাখেন। যা হোক, যে বছরগুলোতে ওসমানী খিলাফত ভেঙ্গে তা প্রজাতন্ত্রে রূপ লাভ করে সেই বছরগুলোতেই তিনি "পুরাতন সাঈদ" থেকে "নতুন সাঈদ"- এ রূপান্তরিত হন। "নতুন সাঈদ"- এ রূপান্তর ছিল জনজীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পড়াশুনা ও ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকা, যা তখন ছিল এক নতুন ধরনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি।

দুই বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ কর্মকান্ড ও দমন নীতির বিরোধিতা করায় তাঁকে পশ্চিম আনাতোলিয়ায় নিবাসিত করা হয় এবং এর পরের সাতাশটি বছর শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার, হয়রানি এবং কারাদন্ড ভোগের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। কিন্তু কারাদন্ড ও নির্বাসনের এই বছরগুলিতেই প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠায় "রিসালা-ই নূর গ্রন্থসমগ্র" লিখিত হয় এবং সমগ্র তুরস্কে তা ছড়িয়ে পড়ে। সাঈদ নুরসী নিজেই বলেন, "এখন আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ই নিজ ক্ষমতা, দূরদর্শিতা, উপলব্ধি এবং ইচ্ছার বাইরে এমনভাবে পরিচালিত হয়েছে যাতে কোরআনের খেদমতের জন্যই এই বইগুলো লিখিত হয়। জ্ঞান চর্চার ব্যয়িত আমার সমগ্র জীবন যেন ছিল "রিসালা-ই নূর" লেখার প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র।"

মুসলিম বিশ্বের অধঃপতনের মূল কারণ যে ঈমানের ভিত্তি দূর্বল হয়ে যাওয়া, একথা বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (রহঃ) বুঝতে পেরেছিলেন। বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদ এবং অন্য সকল শক্তির আক্রমন এক হয়ে উনবিংশ এবং বিংশ শতকে ঈমানের ভিত্তিতে দূর্বল করে দেয়। ফলে তাঁর এই বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, ঈমানকে মজবুত করা এমনকি বাঁচিতে রাখাই বর্তমান সময়ের

সবচেয়ে জরুরী এবং প্রধান কাজ। সে সময় যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে ইসলামের ইমারতকে তার ভিত্তিতে পূণঃনির্মাণ করার নিমিতে সব ধরনের প্রচেষ্টা করা এবং কলমের জিহাদের মাধ্যমে সকল আক্রমণকে প্রতিহত করা।

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (রহঃ) এর নির্বাসিত ও বন্দী জীবনে রচিত "রিসালা-ই নূর" আধুনিক মানুষের কাছে ঈমানের মৌলিক বিষয় ও কোরআনের হাকিকাত ব্যাখ্যা করে। তাঁর নিয়ম ছিল ঈমান ও কুফের দুটিকেই যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। তিনি এটাও দেখান যে কোরআনের নিয়ম অনুসরন করেই ঈমানের হাকিকাত, আল্লাহর অস্তিত্ব ও একাত্ববাদ, রিসালাত এবং সশরীরে পুনরুত্থান এ সবই প্রমান করা সম্বব; কারণ, এই সত্য সমূহ বিশ্বজগৎ এবং মানব কূলের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের যথাযথ ব্যাখ্যা।

বিভিন্ন কাহিনী, উপমা, ব্যাখ্যা এবং জোরালো যুক্তির মাধ্যমে তিনি একথা প্রমাণ করেন যে দ্বীনের হাকিকাত আধুনিক বিজ্ঞানের তথা কুরআনকে অনুসরণ করছে। বস্তুতঃ "রিসালা-ই নূর"-এ তিনি এ কথাই প্রমান করে যে, বিশ্বজগতের কর্মকান্ড বিষয়ক বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধকর আবিস্কার দ্বীনের হাকিকাতকেই বরং মজবুত করে।

রিসালা-ই নূরের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করার কোন অবকাশ নেই কারণ বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (রহঃ) নিজেই তুরস্কের ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে ইসলামী আক্বীদা ও ইমানকে পূনর্জীবিত করেন; এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর এই ভূমিকার গুরুত্ব বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমাগতবাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও "রিসালা-ই নূর" শুধুমাত্র যে মুসলমানদের সমস্যার সমাধান

দেয় তাই নয় বরং সমস্ত মানবকূলের জন্যেও তা বেশ কয়েকটি কারনে গুরুত্বপূর্ণ। "রিসালা-ই নূর" শুধুমাত্র যে মাসুলমানদের সমস্যার সমাধান দেয় তাই নয় বরং সমস্ত মানবকূলের জনৌ তা বেশ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। "রিসালা-ই নূর" লেখা হয়েছে আধুনিক মানুষের মানসিকতাকে লক্ষ্য রেখে, যে মানসিকতা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে জড়বাদী দর্শনে আচ্ছন্ন কোন ব্যক্তির মনে যেসব বিভ্রান্তি, সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়, "রিসালা-ই নূর" তার সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। এটা আধুনিক মানুষের সকল "কি, কেন, কিভাবে"-র উত্তরও দিয়ে দেয়।

"রিসালা-ই নূর" ঈমানের অতি গভীর বিষয়বস্তুসমূহ সাধারন মানুষের জন্য এমন সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করে যে নবীনরাও তা বুঝতে পারে এবং ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ ইতিপূর্বে ঈমানের এ সমস্ত সূক্ষ্ম ও সুগভীর বিষয়ে শুধুমাত্র বিজ্ঞ আলিমগনই পড়াশুনা করতেন। বিশ্বজগৎ এবং মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি রিসালা-ই নূরে এ কথা প্রমাণ করেন যে, প্রকৃত সুখ ঈমান এবং আল্লাহর পরিচয় লাভের মাঝেই নিহিত রয়েছে। তিনি এও দেখিয়ে দেন যে অশান্তি ও যন্ত্রনা যা কুফরের মাধ্যমে জন্ম নিয়ে মানুষের রূহ এবং কালবকে আচ্ছন্ন করে তা শুদুমাত্র প্রকৃত ঈমানের দ্বারাই নিবৃত করা সম্ভব।

পবিত্র কুরআন মানুষের বিবেক-বুদ্ধিতে সম্বোধন করে। এই প্রজ্ঞাময় কিতাব মহাবিশ্ব এবং এর সতত সঞ্চরণশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাতে সে মাখলুক হিসেবে তার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য অসুধাবন করতে

পারে। রিসালা-ই নূরে সাঈদ নুরসী শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিই অনুসরন করেছেন। তিনি মহাবিশ্বের প্রকৃত রূপকে মহা স্রষ্টার নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যা আলোকে এই আয়াত সমূহ যদি পাঠ করা হয় তাহলে ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের হাকিকাত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এমন প্রকৃত ও মজবুত ঈমানের স্তরে পৌছতে সক্ষম হয় যা প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের সূক্ষ্ম বেড়াজাল থেকে উদ্ভূত সংশয় সমূহের মোকাবেলা করতে সক্ষম। সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির অর্থ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করা। এই বিশ্বজগতকে (কায়নাত) যদি এক বিশাল গ্রন্থরূপে দেখা হয় যার প্রতিটি অক্ষম 'গ্রস্থ্ প্রণেতা'র প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাহলে তা ঈমানের বুনিয়াদকে শুধু মজবুতই করে না, তাকে গভীর ও সম্পসারিত করে।

মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে এমন এক দ্বীন যার মাধ্যমে সে মহান স্রষ্টা আল্লাহকে তাঁর সকল সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী সহ চিনতে সক্ষম হয়। 'রিসালা-ই নূর' মানুষের কাছে তার স্রষ্টার পরিচিতি সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করে; এটা মুসলমানদেরকে অনুকরণীয় (তাকলিদি) ঈমান থেকে প্রকৃত (তাহকিকি) ঈমানের দিকে ধাবিত করে; অমুসলিমদেরকে সৃষ্টির উপাসনা থেকে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহবান করে। মহা প্রজ্ঞাময় কুরআনের পথ দেখায়।

'রিসালা-ই নূর' প্রচলিত তাফসিরসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের একটি তাফসীর গ্রন্ত এটা কুরআনের সকল আয়াতের তাফসীর নয় বরং কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানুসের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়।

‘রিসালা-ই নূর’ কতগুলো গ্রন্থের সমষ্টি। এই পুস্তিকাটি রিসালা-ই নূরের অতিব প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম “রোগীদের পথনির্দেশিকা” নামক অধ্যায়সমূহের বাংলা অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছি। যদি কোন বইয়ের অনুবাদে ঐ মূল বাইয়ের হুবহু তুলে ধরা সম্ভব হয় না, তবুও আমরা এ ব্যাপারে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আসলে, রিসালা-ই নূরের প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্য গভীর অর্থবহন করে। সুতরাং পাঠকদের কাছে এর প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্যকে গভীরভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধির মাধ্যমে পাঠ করার জন্য আমাদের সবিনয় অনুরোধ রইল।

পঁচিশতম লেমা
পঁচিশটি প্রতিষেধক

এই রিসালাটি (পুস্তিকাটি) রোগীদের জন্য একটি প্রতিষেধক, সান্ত্বনা এবং ব্যবস্থাপত্র। জিয়ারত এবং আরোগ্য কামনার উদ্দেশ্যে লিখা হয়েছে।

সতর্কতা ও দুঃখ প্রকাশ

এই ব্যবস্থাপত্র রিসালা-ই নূরের অন্য লেখাগুলোর চেয়ে অনেক দ্রুত লেখা হয়েছে,১ সময়ের অভাবে সার্বিক নীতির বাইরে শুধুমাত্র এক নজর দেখেই কোন ধরনের সংশোধন চাড়া প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ খসড়া আকারে রয়ে গেছে। সরাসরি কালবে আসা ইলহামকে শৈল্পিকতা ও সতর্কতার দ্বারা নষ্ট না করার জন্য নতুনভাবে নিরীক্ষণের প্রয়োজনবোধ করিনি। পাঠকগণ বিশেষত অসুস্থরা অপ্রিয় কোন কিছু অথবা অপছন্দনীয় কোন শব্দ ও বাক্যের দ্বারা যেন মনোঃকষ্ট না পায়; বরং আমার জন্য যেন দোয়া করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾

প্রথম প্রতিষেধক

হে উপায়হীন রোগী! দুঃখ পেওনা, ধৈর্য্য ধারণ কর । তোমার এই অসুস্থতা তোমার দুঃখ নয় বরং এক রকম নিয়ামত । কারণ জীবন একটা সম্পদ, শেষ হয়ে যায় । ফল না পেলে ধ্বংস হয়ে যায় । একই সাথে আরাম ও গাফলতের মধ্যে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় । অসুস্থতা তোমার ঐ সম্পত্তিকে লাভের দ্বারা ফলপ্রদ করে । আয়ুকে তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার ফুরসত দেয় না । ধরে রাখে, লম্বা করে যাতে ফল দিয়ে শেষ হয় । তাই, অসুস্থতার দ্বারা আয়ু যে দীর্ঘায়িত হয় তা “মুসিবতের সময় খুব লম্বা, আনন্দ আয়েশের সময় খুবই সংকীর্ণ” প্রবাদ বাক্য আকারে সকলের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে ।

দ্বিতীয় প্রতিষেধক

হে ধৈর্য্যহীন রোগী! ধৈর্য্য ধারণ কর, পারলে শুকরিয়া আদায় কর । তোমার এই অসুস্থতার প্রতিটি মিটি সাধারন জীবনের এক ঘন্টা ইবাদতের সমতুল্য হতে পারে । কারণ, ইবাদত দুই ধরণের একটি হল মুসবত ইবাদতঃ নামায, দোয়ার মত ইবাদত । অপরটি মানফি ইবাদতঃ অসুস্থতা ও মুসিবতের দ্বারা বিপদগ্রস্থ হয়ে নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে অনুভব করে

খালিক-ই রাহীমের (দয়াময় স্রষ্টার) নিকট আশ্রয় নিয়ে প্রার্থনা করা। অর্থাৎ খালিস, রিয়াহীন (কপটতাহীন) এক ইবাদতের অধিকারী হওয়া।

সহীহ রিওয়ায়েত অনুযায়ী অসুস্থতার সাথে অতিবাহিত হওয়া জীবন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি অভিযোগ না করার শর্তে মুমিনের জন্য ইবাদত হিসেবে গন্য হয়।৪ এমনকি অনেক ধৈর্য্যশীল ও শুকরিয়া আদায়কারী রোগীর এক মিনিটের অসুস্থতা এক ঘন্টার ইবাদত এবং কোন কোন কামিল ব্যক্তির এক মিনিটের অসুস্থতা এক দিনের ইবাদনের সমতুল্য, যা সহী রিওয়ায়েত এবং কাশফ-ই সাদিকা৫ দ্বারা প্রমানিত। তোমার এক মিনিটের জিন্দেগীকে এক হাজার মিনিটের সমতুল্য করে তোমাকে লম্বা জীবন লাভ করিয়ে দেয়া অসুস্থতা থেকে অভিযোগ নয় বরং শুকরিয়া আদায় কর।

তৃতীয় প্রতিষেধক

হে সহ্যহীন রোগী! মানুষ এই দুনিয়ায় আনন্দ উৎসব এবং স্বাদ-আস্বাদনের জন্য যে আসে নাই; আগমনকারীদের অনবরত প্রস্থান, যুবকদের বুদ্ধে পরিণত হওয়া এবং সর্বদা নিঃশেস ও বিচ্ছিন্নতার গহ্বরে পতিত হওয়াই তার স্বাক্ষী। একই সাথে মানুষ প্রাণীজগতের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও গঠনে সর্বোত্তম। আর প্রাণীকূলের সুলতান হওয়া সত্ত্বেও অতীতের স্বাদসমূহ এবং ভবিষ্যতের বালাসমূহকে চিন্তা করার কারণ পশুর তুলনায় অনেক নীচু, দুঃখময় ও কষ্টকর এক জীবন অতিবাহিত করে। অর্থাৎ মানুষ এই দুনিয়ায় শুধুমাত্র সুন্দরভাবে বসবাস করা এবং আনন্দ ও শান্তিতে জীবন যাপনের জন্য আসেনি বরং বিশাল মূলধনের অধিকারী মানুষ, ব্যবসার দ্বারা অনন্ত ও

চিরস্থায়ী এক জীবনের শান্তি অর্জনের জন্য কাজ করতে এসেছে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত মূলধন হচ্ছে তার হায়াত।

আর যদি অসুস্থতা না থাকে তাহলে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা গাফলতের জন্ম দেয়; দুনিয়াকে আমোদপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করে, পরকালকে ভুলিয়ে দেয়; কবর এবং মৃত্যুকে স্মরণ করাতে চায় না; জীবন সম্পদকে বেহুদা কাজে ব্যয় করায়। অন্যদিকে অসুস্থতা চোখ খুলে দেয়; শরীর এবং দেহকে বলে- "অমর নও, অবিভাবকহীন নও, তোমার এক দায়িত্ব আছে। অহংকার ত্যাগ কর, সৃষ্টিকর্তাকে চিন্তা কর, কবরে যেতে হবে এটা জানো, সেভাবেই নিজেকে প্রস্তুত কর।

এইদৃষ্টিকোন থেকে অসুস্থতা প্রতারণাহীন এক নাসীহাতকারী এবং সতর্ককারী এক মুর্শিদের (পথ প্রদর্শকের) মত। সুতরাং অসুস্থতা থেকে অভিযোগ নয় বরং শুকরিয়া আদায় কর। আর যদি খুব বেশী কষ্ট হয় তবে সবর প্রার্থনা কর।

চতুর্থ প্রতিষেধক

হে অভিযোগকারী রোগী! অভিযোগে করার অধিকার তোমার নেই বরং শুকুর ও সবর কর। কারণ তোমার শরীর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ সমূহ তোমার মূলক (সম্পদ) নয়। তুমি সেগুলোকে তৈরী করনি। অন্য কোন জায়গা থেকে ক্রয়ও করনি। তার মানে এগুলো অন্য কারও মুল্‌ক (সম্পদ)। আর মালিক তার মুল্‌কগুলোকে (সম্পদগুলোকে) ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। ছাব্বিশতম বাণীতে উল্লেখিত উদাহরনে একজন খুব দক্ষ শিল্পী তার সুন্দর শিল্প ও মূল্যবান সম্পদ প্রদর্শনের জন্য এক গরীব লোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মডেল হিসেবে এক ঘন্টার জন্য বহু মূল্যবান পাথর দ্বারা সজ্জিত এবং অনেক

কারুকার্য খরিচ একটি পোষাক পরায় । পরিহিত অবস্থায় এটির উপর কাজ করে । অতীব সুন্দর কারুকার্যকে প্রদর্শন করার জন্য পোষাকটির কিছু অংশকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা খাটো করে । আর এজন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কার্যরত ঐ মিসকিন লোকটির "আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, উঠা বসার মত দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বিরক্ত করছ । সৌন্দর্য্য বর্ধনকারী পোষাকটিকে কেটে ছোট করে আমার সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করছ" বলার কোন অধিকার আছে কি? "দয়াহীনতা ও ইনসাফহীনতার পরিচয় দিচ্ছ" বলতে পারে কি?

হে রোগী, এই উদাহরণের মতই সানি-ই যুলজালাল চোখ, কান, আকল, কালবের মত নূরানী অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা অতীব সুন্দর কারুকার্য খচিত তোমার শরীর নামক পোষাকে আসমাউল হুসনার (সুন্দর নামসমূহের) শৈল্পিক নিদর্শনসমূহকে প্রদর্শনের জন্য বিভিন্নভাবে এটিকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে । তুমি ক্ষুধার্ত অবস্থা দিয়ে তাঁর রাজ্জাক নামকে যেমন চিনতে পার তেমনি অসুস্থার দ্বারা শাফী নামকেও জান । দুঃখ-কষ্টসমূহ আসমাউল হুসনার এক অংমের হুকুমসমূহকে প্রদর্শন করার কারণে ওগুলোর মাঝে হিকমত তেকে আসা রশ্মিসমূহও রহমত থেকে আসা আলোসমূহ রয়েছে । আবার ঐ আলোসমূহের মধ্যে অনেক সৌন্দর্যও পাওয়া যায় । যদি পর্দা উন্মোচিত হয়, তাহলে ভয়ংকর ও ঘৃণ্য অসুস্থতার আড়ালে আকর্ষণীয় ও সুন্দর অর্থসমূহ খুঁজে পাবে ।

পঞ্চম প্রতিষেধক

হে অসুস্থতায় আচ্ছাদিত রোগী! আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, অসুস্থতা অনেকের জন্য ইলাহী ইহসান ও রাহমানী উপহার স্বরূপ । আমি অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আট নয়

বছর ধরে অনেক যুবক সুস্থতা লাভের জন্য আমার কাছে দু'আ নিতে আসত। লক্ষ্য করলাম যে, অসুস্থ যুবকরা অন্য যুবকদের তুলনায় আখিরাতকে নিয়ে বেশী চিন্তা করছে। তাদের মাঝে যৌবনের উন্মাদনা নেই। গাফলত থেকে উদ্ভূত তীব্র জৈবিক চাহিদাগুলো থেকে এক অর্থে নিজেদেরকে বাঁচিতে রাখছে। সহ্য সীমার মধ্যের অসুস্থতা যে ইলাহী ইহসান তা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতাম। বলতাম, "ভাই, আমি তোমার এই অসুস্থতার বিরুদ্ধে নই। অসুস্থতার জন্য তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে দুঃখ পাচ্ছি না যে দু'আ করব। অসুস্থতা তোমাকে পুরোপুরি সচেতন না করা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করার চেষ্টা কর। অসুস্থতা তার দায়িত্ব শেষ করার পর খালিক-ই রাহীম (দয়াময় স্রষ্টা) ইনশাল্লাহ তোমাকে শিফা দান করবেন।

আরও বলতাম, "তোমার মত কিছু যুবক সুস্থতার কারণে গাফলতে পতিত হয়ে নামাযকে ত্যাগ করে ও কবরকে নিয়ে চিন্তা করে না। আল্লাহকে ভুলে দুনিয়াবী জীবনের এক ঘন্টার বাহ্যিক আনন্দের দ্বারা আখিরাতের অনন্ত জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, নষ্ট করে এমন কি ধ্বংস করে দেয়। অসুস্থতার কারণে অবিসম্ভাবী গন্তব্যস্থল কবর ও তার পরবর্তী অধ্যায়গুলো দেখতে পাচ্ছ এবং সে অনুযায়ী আমল করছো। অর্থাৎ অসুস্থতাই তোমার জন্য সুস্থতা আর তোমার মত অনেক যুবকের ক্ষেত্রে সুস্থতাই হচ্ছে মূলত অসুস্থতা।

ষষ্ঠ প্রতিষেধক

হে কষ্টসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী রোগী! তোমাকে বলিঃ অতীত জীবনকে চিন্তা কর ও ঐ সময়ের আনন্দঘন দিনগুলো এবং বালা-মুসিবতের সময়গুলোকে স্মরণ কর। অবশ্যই

"আহ (কি মজা)" অথবা 'উহ' (কি কষ্ট) বলবে। অর্থাৎ, তোমার হৃদয় অথবা মুখ থেকে "শুকুর, আলহামদুলিল্লাহ" অথবা "কি দুঃখ, কি কষ্ট" উচ্চারিত হবে।

লক্ষ্য কর, বিগত দিনগুলির দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসিবতের কথা চিন্তা করে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করছ যার কারনে তোমার কালব শুকরিয়া আদায় করে "শুকুর আলহামদুলিল্লাহ" বলেছে। কারণ, কষ্টের সমাপ্তিই আনন্দ। ঐ দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসিবতগুলা বিদায়লগ্নে রূহে এক আনন্দের মিরাস রেখে যায় যা নিয়ে চিন্তা করলে আনন্দ পায় এবং শুকরিয়া আদায় করে।

বিগত দিনগুলিতে অতিবাহিত আনন্দঘন ও সুখ সমৃদ্ধ অবস্থাগুলো তোমাকে "কি দুঃখ, কি কষ্ট' বলায়; যার সমাপ্তি তোমার রূহে সার্বক্ষণিক দুঃখ-কষ্ট রেখে যায়; যখনই চিন্তা কর তখনই ঐ দুঃখ নতুন করে জেগে উঠে, আফসোস ও শূণ্যতা তোমাকে তাড়া করে বেড়ায়।

কখনও কখনও একদিনের অবৈধ ভোগ-বিলাস (গাইরি মাশরু) এক বছরের মানসিক কষ্টের কারণ হয়। আর সাময়িক একদিনের অসুস্থতার কষ্ট থেকে অনেক দিনের সওয়াব অর্জনের পাশাপাশি এক ধরনের স্বাদও আস্বাদন করা যায়। কষ্টের সমাপ্তি থেকে আসে মুক্তি আর এই মুক্তিতে আছে সুপ্ত আনন্দ। এখন তোমার এই সাময়িক অসুস্থতার ফলাফল এবং এর অন্তনিহিত সওয়াবের কথা চিন্তা কর। 'ইনশাল্লাহ এটাও চলে যাবে' বল, অভিযোগের পরিবর্তে শুকরিয়া আদায় করা।

ষষ্ঠ প্রতিষেধক

দুনিয়ার আনন্দের কথা চিন্তা করে অসুস্থতার দরুন কষ্ট ভোগকারী হে আমার ভাই! যদি এই দুনিয়া চিরস্থায়ী হত, আমাদের পথে মৃত্যু না থাকত, বিচ্ছিন্নতা ও নিঃশেষের বাতাস না বইত, মুসিবতপূর্ণ ও ঝঞ্জামর ভবিষ্যতে শীতকাল না আসত তাহলে আমিও তোমার সাথে তোমার অবস্থার জন্য দুঃখ পেতাম। কিন্তু, যেহেতু দুনিয়া একদিন আমাদেরকে 'বেরিয়ে যাও' বলবে এবং আমাদের ফরিয়াদগুলোকে উপেক্ষা করবে; তাই পৃথিবী আমাদের বাহিরে ছুড়ে দেওয়ার আগেই অসুস্থতার সতর্কবাণীর দ্বারা এখনই আমরা তার মহব্বতকে পরিত্যাগ করি। দুনিয়া আমাদেরকে ত্যাগ করার আগেই কালব থেকে তাকে ছুঁড়ে ফেলতে সচেষ্ট হই।

অসুস্থতা এই গভীর তাৎপর্যকে তুলে ধরে বলে, "তোমার শরীর পাথর বা লোহা থেকে তৈরী নয়। বরং অনবরত পৃথক হয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য বহনকারী বিভিন্ন জিনিসের দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। কাজেই অহংকার ছাড়, দূর্বলতাকে বুঝ, মালিককে চিন, তোমার দায়িত্বগুলোকে জান, দুনিয়ায় কি জন্য এসেছ তা শিখ।" প্রতিনিয়ত এভাবেই তোমার কালব তোমার গোপনে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যেহেতু দুনিয়ার আনন্দ আর মজা ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে শরীয়ত সম্মত না হলে তা হয় সাময়িক, কষ্টময় ও গুনাহপূর্ণ। ঐ আনন্দকে হারানোর ফলে অসুস্থতাকে দোষ দিয়ে কেঁদনা বরং অসুস্থতার মাঝে নিহিত ইবাদত ও সওয়াবের কথা চিন্তা কর এবং তা থেকে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করো।

সপ্তম পরিষেধক

সুস্থতার আনন্দকে হারানো হে রোগী! তোমার অসুস্থতা সুস্থতার মাঝে নিহিত ইলাহী নিয়ামতগুলোর স্বাদকে ধ্বংস করে না বরং আস্বাদন করায় ও বৃদ্ধি করে। কারণ কোন কিছু সর্বদাই বিরাজমান থাকলে তার মূল্য কমে যায়। এমনকি আহলি হাকিকাত একমত যে

إِنَّمَا الْأَشْيَاء تُعْرَفُ بِأَضْدادِهَا

অর্থাৎ, কোন কিছুর মূল্য তার বিপরীতে অবস্তা থেকে উপলব্ধি করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, অন্ধকার না থাকলে আলোর গুরুত্ব বোঝা যায় না, অর্থহীন হয়। ঠান্ডা না থাকলে গরম বোঝা যায় না, আনন্দহীন হয়। ক্ষুধা না থাকলে খাবারে মজা পাওয়া যায় না, পিপাসা না পেলে পানি পানে কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। অসুস্থতা না থাকলে সুস্থতার আনন্দ উপলব্ধি করা যায় না। রোগ না হলে সুস্থতা লজ্জতহীন হয়।

ফাতির-ই হাকিম ইনসানকে সব ধরনের ইহসান এবং সকল প্রকার নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদনের দ্বারা সর্বদা শুকরিয়ার দিকে ধাবিত করতে চায়। কাইনাতের (বিশ্ব ব্রহ্মা-ের) নানা ধরনের অসংখ্য নিয়ামতকে ভোগ করবে, চিনতে পারবে এমন অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা মানুষকে সাজানোর মাধ্যমে প্রতিয়মান হয় যে, সুস্থতা ও সবলতা যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি অসুস্থতা ও দুঃখ–কষ্টও দেওয়া হবে।

তোমার কাছে জানতে চাচ্ছিঃ "তোমার মাথায়, হাতে অথবা পেটে এই অসুখ যদি না হত তাহলে মাথা, হাত ও পেটের সুস্থতার মাঝে বিদ্যমান লজ্জত ও আনন্দময় ইলাহী নিয়ামতকে

উপলদ্ধি করে শুকরিয়া আদায় করতে কি? অবশ্যই শুকরিয়াতো নয়ই বরং চিন্তাও করতে না। অসেচতনভাবে ওই সুস্থতাকে গাফলতের দ্বারা হয়ত অবৈধ ভোগবিলাসের ব্যয় করতে।

অষ্টম প্রতিষেধক

আখিরাত নিয়ে চিন্তিত হে রোগী! অসুস্থতা সাবানের মতো গুনাহসমূহকে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে। সহীহ্ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যে অসুস্থতা হচ্ছে কাফফারাতুজ্জুনুব (গুনাহ মাফের উসিলা) হাদীসে আছে, "গাছের পরিপক্ক পলগুলো যেমন গাছকে নাড়া দিলে ঝড়ে পড়ে।"

গুনাহগুলো চিরস্থায়ী হায়াতের (হায়াত-ই আবাদিয়ার) জন্য সার্বক্ষণিক অসুস্থতা স্বরূপ। এমনকি এই দুনিয়ার জীবনেও কালব, বিবেক এবং রূহের জন্য এক ধরনের অসুস্থতা। তুমি যদি ধৈর্য ধারণ করে অভিযোগ না কর তাহলে এই অস্থায়ী অসুস্থতার দ্বারা চিরস্থায়ী অনেক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাবে। যদি গুনাহগুলোর কথা চিন্তা না কর অথবা আখিরাতকে না চিনো কিংবা আল্লাহকে না জানো তাহলে বুঝতে হবে যে, তোমার মধ্যে এমন এক ভয়ংকর রোগ রয়েছে যা তোমার দুনিয়াবী ছোট্ট অসুস্থতার তুলনায় কোটিগুন বড়; তা থেকে ফরিয়াদ কর। দুনিয়ার সবকিচুর সাথে তোমার কালব, রূহ ও নাফসের সম্পর্কে আছে। সর্বদাই বিচ্ছিন্নতা ও ধ্বংসের দ্বারা ঐ সম্পর্ককে ছিন্ন করে তোমার মাঝে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি করে। বিশেষত আখিরাতকে না জানার কারণে মৃত্যুকে চিরস্থায়ীভাবে হারিয়ে যাওয়া হিসেবে চিন্তা করায় দুঃখ কষ্টের মধ্যে দুনিয়াসম এক জীবনের অধিকারী তুমি। তাই সর্বপ্রথম, সীমাহীন ক্ষত ও অসুস্থতা সম্পন্ন এই বিশাল রূপক শরীরের জন্য সঠিক ঔষধ

ও প্রতিকার প্রদানকারী ঈমান নামক প্রতিষেধককে খোঁজা এবং ইতিকাদকে সংশোধন করা দরকার। এই পার্থিব অসুস্থতার দ্বারা ছিন্ন গাফলতের পর্দার মাঝ দিয়ে প্রকাশিত তোমার দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের জানালা দিয়ে কাদির-ই যুলজালালের কুদরত ও রহমতকে দেকা ও জানাই হচ্ছে ঐ প্রতিষেধক পাওয়ার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ।

যে আল্লাহ তায়ালাকে চিনে না তার জন্য রয়েছে দুনিয়া সমতুল্য বালা-মুসিবত। যে আল্লাহকে জানে তার দুনিয়া নূর ও আনন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ। মর্তবা অনুযায়ী ঈমানী শক্তির দ্বারা তা অনুভব করে। এই ঈমান থেকে আসা স্বাদ ও শিফা এবং লজ্জতের নীচে অসুস্থতার কষ্টসমূহ চাপা পড়ে যায়, শেষ হয়ে যায়।

নবম পরিষেধক

হে স্রষ্টাকে জ্ঞাত রোগী! অসুস্থতার মাঝে বিদ্যমান দুঃখ ও ভয়-ভীতির কারণ হলো অসুস্থতা অনেক সময় মৃত্যুর উসিলা হয়ে থাকে। গাফলতের দৃষ্টিতে এবং বাহ্যিকভাবে মৃত্যু খুব ভয়ংকর হওয়ার মরণ ব্যধিগুলো ভীতি ও উদ্বেগের জন্ম দেয়।

প্রথমতঃ জেনে রাখ এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস কর যে, "মৃত্যু নির্ধারিত, একে পরিবর্তন করা যায় না।" মুমূর্ষু রোগীদের পাশে ক্রন্দনরত এবং সুস্থরাই মুতৃ্যবরণ করে অন্যদিকে ঐ মুমূর্ষু রোগীরা সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু বাহ্যিকভাবে ভয়ংকর মনে হলেও আসলে তা নয়। রিসালা-ই নূরের অনেকাংশে কুরআন থেকে প্রাপ্ত নূরের দ্বারা সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করা হয়েছে

যে, মুমিনদের জন্য মৃত্যু হচ্ছে- ‘জীবনের দায়-ভার থেকে মুক্তি, দুনিয়া নামক পরীক্ষাক্ষেত্র থেকে মুক্তি, শিক্ষা ও পালনের সমষ্টি ইবাদনের সমাপ্তি, পরজগতে প্রস্থানকারী শতকরা নিরানব্বইজন দোস্ত ও আত্মীয়ের নিকটে পৌছার উসিলা, হাকিকি আবাসস্থল ও চিরস্থায়ী শান্তির নিবাসে পৌঁছার মাধ্যম, দুনিয়া নামক জেলখানা থেকে জান্নাতের বাগিচায় আগমনের দাওয়াত, খালিক-ই রাহীমের (দয়াময় স্রষ্টা) ইহসান থেকে নিজ খেদমতের প্রাপ্য মূল্য গ্রহণের সময় ।’

অতএব, মুত্যুর আসল রূপ যেহেতু এটাই সেহেতু তাকে ভয়ংকর হিসেবে না দেখে বরং রহমত ও শান্তির সূচনা হিসেবে চিন্তা করা দরকার ।

আল্লাহর ওলিদের একাংশের মৃত্যুকে ভয় করার কারণ এর ভয়ংকরতা নয় বরং আরো ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব অর্জন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া । ঈমানদারদের (আহলি ঈমানের) জন্য মৃত্যু হচ্ছে রহমতের দরজা আর পথভ্রষ্টদের (আহলি দালালতের) অন্ধকারাচ্ছন্ন চিরস্থায়ী কূপ ।

দশম প্রতিষেধক

অপ্রয়োজনীয় কৌতুহলের অধিকারী হে রোগী! তুমি তোমার অসুখের জটিলতার জন্য উদগ্রীব । এই ব্যাকুলতা তোমার অসুখকে আরো জটিল করবে । আরোগ্য লাভ করতে চাইলে উদগ্রীব না হওয়ার চেষ্টা করো । অর্থাৎ অসুখের ফায়দাগুলো, সওয়াব এবং তা থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া যাবে এরূপ চিন্তা কর, উদ্বেগ পরিহার করে অসুখকে সমূলে উচ্ছেদ কর ।

উৎকণ্ঠা অসুখকে দ্বিগুন পরিমানে বৃদ্ধি করে। উৎকণ্ঠার কারণে এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা কালবে আসে যার উপর ভয় করে ঐ রোগ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদি আত্মসমর্ত্তণের মাধ্যমে এবং সন্তুষ্টির দ্বারা অসুখের মাঝে নিহিত হিকমতের কথা চিন্তা করে ঐ উদ্বেগ দূর করা হয় তাহলে সেই রোগের গুরুত্বপূর্ণ একটি কারন দূরীভুত হয়, রোগও কিছুটা কমে আসে। বিশেষত অহেতুক ভয়ের কারণে এক দিরহাম অসুস্থতা কখনও কখনও উৎকণ্ঠার দ্বারা দশ দিরহামের অসুস্থতায় পরিণত হয়। উৎকণ্ঠা দূর হলে ঐ অসুস্থতার দশ ভাগের নয় ভাগ ভাল হয়ে যায়। উদ্বিগ্নতা, একদিকে অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণ অন্যদিকে ইলাহী হিকমতকে কটাক্ষ এবং ইলাহী রহমতের সমালোচনা ও খালিক-ই রাহীমের (দয়াময় স্রষ্টার) বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে গণ্য হয়। এই অবস্থা আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দনীয় না হওয়াই অসুস্থতাও বৃদ্ধি পায়।

শুকরিয়া যেমন নিয়ামতকে বৃদ্ধি করে তেমনি অভিযোগও অসুস্থতা ও মুসিবতকে বৃদ্ধি করে। উদ্বিগন্নতা নিজেও এক ধরনের অসুখ। আর এর প্রতিষেধক হলো অসুখের হিকমতকে জানা। যেহেতু তুমি অসুখের হিকমত ও ফায়দাগুলো জান সেহেতু ঐ ঔষধ (মলম) কে উৎকণ্ঠার উপর লাগিয়ে মুক্তি লাভ কর। ‘উহ’ এর পরিবর্তে ‘আহ’ বল, “হায় আমার কি হবে!” বলার পরিবর্তে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ বল।

এগারতম প্রতিষেধক

হে সবরহীন অসুস্থ ভাই! অসুস্থতার বর্তমানে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে কিন্তু অতীতের অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভের সময় হতে আজ পর্যন্ত তুমি ঐ অসুস্থতা থেকে মুক্তির মাঝে বিরাজমান

আনন্দ এবং অর্জিত সওয়াবের মাঝে নিহিত রূহানী লজ্জত উপভোগ করছ। আজ তেকে হয়তবা এই মুহূর্তের পর থেকে আর কোন অসুখ থাকবে না, অসুখ না থাকলে কষ্টও থাকবে না, কষ্ট না থাকলে ব্যাথিত হওয়ার প্রশ্নও আসে না। তুমি অহেতুক এক ধরনের ভীতি পোসন করায় সবরহীনতার পরিচয় দিচ্ছ। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত অসুস্থতা দূর হওয়ার কষ্টও তার সঙ্গে দূরীভূত হয়েছে, সওয়াব এবং রোগ মুক্তির আনন্দ তোমার নিকট রয়ে গেছে। সুতরাং যেখানে লাভবান হওয়ার কারণে তোমার আনন্দিত হওয়ার কথা সেখানে সেগুলিকে স্মরণ করে ব্যথিত হওয়া ও সবরহীনতার পরিচয় দেয়া উন্মাদনা ছাড়া আর কিচুই নয়। ভবিষ্যতের দিনগুলো যেহেতু এখনও আসেনি সেহেতু অজানা দিনগুলোর অজানা অসুখের অজানা কষ্টগুলোকে অহেতুক কল্পনা করে ব্যথিত হওয়া এবং সবরহীনতার পরিচয় দিয়ে এই তিন ‘অজানা’কে বাস্তবে রূপ দেয়া পাগলামী ছাড়া আর কি হতে পারে?

যেহেতু অতীতের অসুস্থতার সময়গুলোকে এখন তোমার আনন্দ দিচ্ছে এবং যেহেতু এই মুহূর্তের পরের সময়গুলোর অস্তিত্ব অজানা, অসুখও অজানা, কষ্টও অজানা সেহেতু তুমি জনাব-ই হাক কর্তৃক তোমাকে প্রদত্ত সবর শক্তিকে জানে-বামে খরচ না করে এখনকার কষ্টের বিরুদ্ধে কর কর; ‘ইয়া সাবুর!’ বলে ধৈর্য্য ধারণ করো।

বারতম প্রতিষেধক

অসুস্থতার কারণে ইবাদত ও যিকির-আযকার থেকে বঞ্চিত এবং এই বঞ্চনার কারণে ব্যথিত হে রোগী! জেনে রেখ, হাদীসের দ্বারা সুনির্দিষ্ট যে অসুস্থতার কারণে মুত্তাকী মুমিন

তার নিয়মিত যিকির করতে না পারলেও সে যিকিরের সওয়াব পায়। ফরযকে সাধ্যমত আদায়কারী রোগী সবর ও তায়াক্কুল করলে কঠিন অসুস্থতার সময় অনেক সুন্নাত আদায় করতে না পারলেও সুন্নাতের ঐ সওয়াবগুলো অসুস্থতার দ্বারা খালিসভাবে অর্জিত হয়ে থাকে। আবার অসুস্থতা, ইনসানের মাঝে বিদ্যমান অক্ষমতা ও অসহায়ত্বকে অনুভব করায়; অক্ষমতা ও দুর্বলতা, আচরণ ও কথার মাধ্যমে দোয়া করিয়ে নেয়। জনাব-ই হাক, ইনসানকে সীমাহীন অক্ষমতা ও দুর্বলতা দিয়ে তৈরী করেছেন যেন সে সর্বদা ইলাহী দরগাহে দোয়া ও প্রার্থনা করে।

﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ﴾

অর্থাৎ, “দোয়াই যদি না থাকবে তাবে তোমাদের মূল্যই বা কি আছে!” আয়াতের গভীর মর্ম অনুযায়ী ইনসান সৃষ্টির হিকমত এবং ইনসানের মূল্যবান হওয়ার কারণ তার আন্তরিক দোয়া ও নিয়াজ। আর এই দোয়া ও নিয়াজের উসিলা অসুস্থতা হওয়ায় তা থেকে অভিযোগ নয় বরং আল্লাহ তায়ালার নিকট শুকরিয়া আদায় করা এবং অসুস্থতার কারণে প্রবাহিত দোয়ার ঝরণাকে সুস্থতা লাভের মাধ্যমে শুকিয়ে না ফেলা দরকার।

তেরতম প্রতিষেধক

অসুস্থতার থেকে অভিযোগকারী হে উপায়হীন ব্যক্তি! অনেকের জন্য অসুস্থতা গুরুত্বপূর্ণ এক খনি ও অতি মূল্যবান এক ইলাহী উপহার। প্রত্যেক রোগী তার রোগকে এভাবে অনুধাবন করতে পারে।

মৃত্যুক্ষন সুনির্দিষ্ট নয়। জনাব-ই হাক ইনসানকে চরম হতাশা ও সীমাহীন গাফলত থেকে মুক্ত করে খাউফ (ভয়) ও রেজার (আশার) মাঝে রেখে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কেই

রক্ষা করার জন্য হিকমতের প্রয়োজনে মৃত্যুক্ষণকে গোপন রেখেছেন।

যেহেতু মৃত্যু যে কোন সময় আসতে পারে সেহেতু ইনসান গাফলতির মাঝে থাকা অবস্থায় মারা গেলে চিরন্তন জীবনে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। অসুস্থতা, গাফলতিকে দুরীভূত করে, আখিরাতকে নিয়ে চিন্তা করায় ও মৃত্যুকে স্মরণ করায় এবং এভাবেই ইনসানকে মৃত্যুর জন্য তৈরি করে। অনেক সময় অসুস্থতা কুড়ি দিনে এমন এক মর্তবায় পৌঁছে দেয় যা কুড়ি বছরেও অর্জন করা যায় না।

মোট কথা, আমাদের বন্ধুদের মাঝে (আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুক) দুজন যুবক ছিল। এদের একজন হলো ইলামা নিবাসী সাবরি অপরজন ইসলাম গ্রামের উজরপুত্র মোস্তফা। আমার তালাবা এই দুই ব্যক্তির নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকতায় ও ঈমানের খেদমতে সর্বাগ্রে তাদের অবস্থান আমাকে বিস্মিত করত। এর হিকমত জানতাম না। তাদের মৃত্যুর পর বুঝলাম তাদের প্রত্যেকের বড় ধরনের অসুখ ছিল। তারা ঐ অসুস্থতার ইরশাদের কারণে অন্যান্য গাফিল ও ফরযত্যাগকারী যুবকদেরকে অনুকরণের পরিবর্তে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক তাকওয়া ও খুবই মূল্যবান এক খেদমতে এবং আখিরাতের জন্য উপকারী এক অবস্থানে পৌঁছেছে। ইনশাল্লাহ দুই বছরের অসুস্থতার কষ্ট কোটি কোটি বছরের চিরন্তন (হায়াতের) শান্তি লাভের উসিলা হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি তাদের সুস্থতার জন্য যে দোয়া আমি করেছি তা দুনিয়াবী দৃষ্টিকোন থেকে তাদের জন্য বদদোয়া হয়েছে। ইনশাল্লাহ আমার ঐ দোয়া তাদের আখিরাতের মুক্তির জন্য কবুল হয়েছে।

বস্তুত আমার বিশ্বাস, এই দুই ব্যক্তি দশ বছরের তাকওয়া দ্বারা অর্জিত সওয়াবের সমপরিমান লাভ করেছে । যদি ঐ দুইজন অন্য অনেক যুবকের ন্যায় সুস্বাস্থ্য ও যৌবনের উপর ভরসা করে গাফলত ও অবৈধ ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হতো এবং মৃত্যুও যদি তাদেরকে অনুসরণ করে গুনাহর মাঝে ডুবন্ত অবস্থায় ধরে ফেলতো তাহলে ঐ নূরসমূহের পরিবর্তে তাদের কবর সাপ ও বিচ্ছুর বাসায় পরিণত হতো ।

যেহেতু অসুস্থতায় এরূপ লাভ ও উপকারিতা রয়েছে সেহেতু তা থেকে অভিযোগ নয় বরং রোগীর দায়িত্ব হচ্ছে তাওয়াক্কুল ও সবরের দ্বারা শুকরিয়া আদায় করে ইলাহী রহমতের প্রতি ভরসা করা ।

চৌদ্দতম প্রতিষেধক

হে পর্দাবৃত চোখের অধিকারী রোগী! ঈমানদারের (আহলি ঈমানের) চোখে উদ্ভুত পর্দার অন্তরালে কি ধরনের নূর ও গোপন এক চোখ বিদ্যমান রয়েছে তা জানলে ‘আমার রব-ই রাহীমের নিকট লক্ষবার শুকরিয়া জানাই’- বলতে । এই প্রতিষেধকের ব্যাখ্যার জন্য আমি একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে চাই । তা হলো- আট বছর পরিপূর্ণ আস্থার সাথে বিরক্তিহীনভাবে আমার খেদমতে নিয়োজিত বারলা নিবাসী সুলাইমানের ফুফু এক সময় অন্ধ হয়ে যায় । ঐ সালিহা মহিলা আমার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালো ধারণা পোসণ করতো । আমাকে মসজিদের দরজায় পেতে বলল, “অন্ধত্ব থেকে মুক্তির জন্য দোয়া কর ।” আমিও ঐ মুবারক ও ইলাহী আশ্‌ক-এ আকৃষ্ট মহিলার দ্বীন-দারিত্ব (সালাহাতকে) আমার দোয়ায় শাফায়াতকারী বানিয়ে “হে আমার রব, তার দ্বীনদারিত্বের (সালাহাতের সম্মানে অন্ধত্ব

দূর করে দাও” বলে আল্লাহর নিকট কাকুতি মিনতি করলাম। পরের দিন বুরদুর থেকে চোখের ডাক্তার এসে চোখের অন্ধত্ব দূর করল। চল্লিশ দিন পর আবার তার অন্ধত্ব ফিরে এল। আমি খুব ব্যথিত হলামও দোয়া করলাম। ইনশাল্লাহ ঐ দোয়া আখিরাতের জন্য কবুল হয়েছে। অন্যথায় আমার দোয়া তার প্রতি বড় ধরনের বদদোয়া হতো। কারণ মৃত্যুর আগমনে চল্লিশ দিন বাকী ছিল। চল্লিশদিন পর (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুক) মৃত্যু বরণ করল।

ঐ মরহুমা, চল্লিশদিন বারলার বিষন্নতা ছড়ানো বাগানগুলোকে ব্যথা-বেদনার সাথে বৃদ্ধ বয়সের চোখ দিয়ে দেখার পরিবর্তে কবরে জান্নাতের বাগানগুলোকে চল্লিশ হাজার দিন ধরে উপভোগের সুযোগ লাভ করেছে। কারণ তার ঈমান ছিল খুবই শক্তিশালী এবং দ্বীনদারিত্বে ছিল সে অতিমাত্রায় অগ্রসর।

একজন মুমিনের চোখে পর্দা পড়লে এবং অন্ধ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে মর্তবা অনুযায়ী অন্যান্য কবরবাসীর চেয়েও অধিক ঐ নূরের জগৎকে দর্শন করতে পারে। আমরা এই দুনিয়াতে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অন্ধ মুমিনরা তা দেখতে পাচ্ছে না। ঐ অন্ধরা ঈমানের সাথে কবরে গমন করে থাকলে অন্যান্য কবরবাসীর চেয়ে ঐ পরিমান বেশী দেখতে পায়। সবচেয়ে দূরবর্তী কিছুকে দূরবীনের সাহায্যে দেখার মতই কবরে মর্তবা অনুযায়ী জান্নাতের বাগানসমূহকে সিনেমার মত দেখে থাকে।

মাটির নিচে থাকা অবস্থায় আকাশসমূহের উপরস্থিত জান্নাতকে দেখবে এমন নূর সম্পন্ন এক চোখ এই চোখের পর্দার আড়ালে বিদ্যমান যাকে শুকুর ও সবরের দ্বারা খুঁজে

পেতে পার। আর কুরআন-ই কারীম চক্ষু চিকিৎসক হিসেবে ঐ পর্দাকে তোমার চোখ থেকে সরিয়ে দিয়ে ঐ চোখ দ্বারা তোমাকে দেখাবে।

পনেরতম প্রতিষেধক

হে হা-হুতাশকারী রোগী! রুগ্নতার বাহ্যিক রূপ দেখে 'উহ!' বলিও না, এর গভীর মর্ম অনুধাবন করে 'আহ!' বল। অসুস্থতার যদি সুন্দর ও গভীর তাৎপর্য না থাকত তা হলে খালিক-ই রাহীম (দয়াময় স্রষ্টা) তার সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকে অসুস্থতা দিতেন না। সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে-

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَوْلِيَاءُ ثُمَّ اَلْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

অর্থাৎ "মানুষের মাঝে সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে কামিল ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশী মুসিবত ও কষ্টের সম্মুখীন হয়।"

সর্বাগ্রে হযরত আইয়ুব (আঃ), আম্বিয়াগণ, আউলিয়াগণ এবং দ্বীনদারগণ তাদের সমস্ত অসুস্থতাকে একেকটি খালিস ইবাদত ও রাহমানী উপহার (হাদিয়া-ই রাহমানিয়া) হিসেবে উপলব্ধি করেছেন এবং সবরের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করেছে। সকল অসুস্থতাকে খালিক-ই-রাহীমের (দয়াময় স্রষ্টার) রহমত থেকে আগত এক ধরনের অপারেশন হিসেবে মনে করেছেন।

হে বেদনা প্রকাশকারী রোগী! এই নূরানী কাফিলায় যোগ দিতে চাইলে সবরের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় কর। অন্যথায় অভিযোগ করলে তারা তোমাকে তাদের কাফিলায় নিবে না, গাফলতে নিমজ্জিতদের দলভুক্ত হবে। অন্ধকার এক পথে ধাবিত হবে।

এমন অনেক রোগ আছে যেগুলোতে মৃত্যুবরণ করলে শহীদ হিসেবে গণ্য হয়, শাহাদাতের মত ওলায়েতের মর্তবা অর্জন করা যায়।

মোট কথা, সন্তান প্রসবকালীন সময়ের রোগসমূহে, পেটের পীড়ায়, পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে কিংবা মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ হিসেবে গণ্য হয়। এরকম আরও অনেক মুবারক রোগ রয়েছে যেগুলোতে মৃত্যুবরণ করলে রোগী ওলায়াতের মর্তবা লাভ করে। অসুস্থতা দুনিয়ার প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণকে কমিয়ে দেয়ার দুনিয়া পুজারীর (আহলি দুনিয়ার) জন্য মৃত্যুর পীড়া ও বেদনাকে অনেকটা প্রশমিত করে, অনেক সময় মৃত্যুটাকে তার নিকট প্রিয় করে তুলে।

ষোলতম প্রতিষেধক

কষ্টসমূহ থেকে অভিযোগকারী হে রোগী! অসুস্থতাকে, সামাজিক জীবনে মানুষের মাঝে শ্রদ্ধা ও দয়ার মত খুব গুরুত্বপূর্ণ ও অতি সুন্দর গুণাবলীর উদ্রেক করে।

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ * أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ﴾

আয়াতের গভীর তাৎপর্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট যে, সুস্বাস্থ্য ও সবলতা থেকে উদ্ভুত অমুখাপেক্ষীতার (ইসতিনার) মাঝে নিহিত নাফসে আম্মারা, শ্রদ্ধার পাত্র ভাইয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না এবং মারহামাত (দয়া) ও শাফকাত পাওয়ার অধিকারী মুসিবতগ্রস্থ ও রোগীদেরকে দয়া করে না। যে সময় অসুস্থ হয় এবং ঐ অসুস্থতার দ্বারা নিজের দূবলতা ও অক্ষমতাকে বুঝতে পারে তখন শ্রদ্ধার যোগ্য ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। সাক্ষাত অথবা সহায়তার জন্য আসা মুমিন ভাইদের

প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অনুভব করে। মুসিবতগ্রস্থদের প্রতি মারহামাত (দয়া) অনুভব করে যা মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি অনুভূতি থেকে উদ্ভুত শাফকাত-ই ইনসানিয়া এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আচরণগুলোর অন্যতম। এই মারহামাতের দ্বারা তাদেরকে নিজের সাথে তুলনা করে তাদের জন্য পরিপূর্ণভাবে দুঃখ অনুভব করে, শাফকাত প্রদর্শন করে, সর্বোত্তমভাবে সহযোগীতা করে, কিছু করতে না পারলে তাদের জন্য দোয়া করে, সুন্নাত হিসেবে রোগীর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য রোগীকে দেখতে যায়, সওয়াব অর্জন করে।

সতেরতম পরিষেধক

অসুস্থতার ফলে পূণ্যের কাজ করতে না পারার কারণে অভিযোগকারী হে রোগী! শুকরিয়া আদায় কর। অসুস্থতা তোমার জন্য পূণ্যময় কাজসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে খালিসটির পথ খুলে দিয়েছে। অসুস্থতা, সর্বদাই রোগী এবং আল্লাহ তায়ালার খুশীর জন্য রোগীর খেদমতকারী উভয়ের জন্য সওয়াবের কারণ ও দোয়া কবুলের সর্বোৎকৃষ্ট উসিলা।

রোগীর খেদমতের মাঝে, ঈমানদারের (আহলি ঈমান) এর জন্য প্রচুর সওয়াব রয়েছে। রোগীর খোঁজ খবর নেয়া, রোগীকে কষ্ট না দিয়ে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হওয়া হচ্ছে সুন্নাত ও কাফফারাতুযযুনুব (গুনাহ মাফের উসিলা)। হাদীসে আছে, রোগীর দোয়া গ্রহন কর; তাদের দোয়াসমূহ মাকবুল।

বিশেষ করে রোগী যদি আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে থেকে হয় কিংবা যদি তার বাবা-মা হয় তাহলে তাদের খেদমত করা সুউচ্চ এক ইবাদত ও বিশাল এক সওয়াব। রোগীর হৃদয়কে জয় করতে পারা, তাদেরকে শান্তনা দেয়া এক সুউচ্চ সাদাকা

হিসেবে গৃহীত হয়। ঐ সন্তানই সৌভাগ্যবান যেন কিনা বাবা-মায়ের অসুস্থতার সময় দ্রুত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠা তাদের মনকে জয় করে ও খুশী করে ভাল দোয়াসমূহ অর্জন করে।

সামাজিক জীবনের হাকিকাতে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধার পাত্র বাবা ও মায়ের মমতার প্রতিদান হিসেবে তাদের অসুস্থতার সময় পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দ্বারা খেদমতকারী সন্তানকে মানবতার সর্বোচ্চ মহিমাকে প্রদর্শন করো জন্য ফেরেশতারাও 'মাশাল্লাহ, বারাকাল্লাহ' বলে করতালি দেয়।

অসুস্থতার সময়, অসুস্থতার দুঃখকে দূরীভূতকারী অতি সুন্দর ও প্রশান্তিময়, চারদিন থেকে প্রস্ফুটিত মমতা এবং দুঃখানুভব ও দয়া থেকে আসা আনন্দ রয়েছে। রোগীর দোয়া মাকবুল হওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি ৩০-৪০ বছর ধরে আমার মধ্যে কুলুনচ নামক এক রোগের শিফার জন্য দোয়া করতাম। আমি বুঝতে পারলাম, অসুস্থতা দোয়া করার জন্য দেয়া হয়েছে। দোয়ার দ্বারা দোয়াকে অর্থাৎ দোয়া নিজেই নিজেকে অস্থিত্বহীন না করায় বুঝলাম এ দোয়ার ফল আখিরাতের জন্য।

দোয়া একধরনের ইবাদত এবং রোগী অসুস্থতার দ্বারা নিজের দুর্বলতাকে বুঝে ইলাহী দরগায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সে জন্য ত্রিশ বছর ধরে শিফার জন্য দোয়া করছি। আপাতদৃষ্টিতে কবুল না হওয়ার পরেও দোয়া ছেড়ে দোয়ার কথা অন্তরে আসেনি। কারণ অসুস্থতা দেয়ার ওয়াক্ত, শিফা ও য়োর প্রতিফল নয় বরং হাকীম-ই রাহীম শিফা দিলে সেটা তার দয়া থেকে দান করেন।

আর দোয়া যদি আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে কবুল না হয় তাহলে যাবে না যে দোয়া কবুল হয় নাই। খালিক-হাকীম

(বিজ্ঞ স্রষ্টা)-ই ভাল জানেন; আমাদের জন্য যা উত্তম তাই তিনি দান করেন । কখনও দুনিয়ার জন্য আমাদের করা দোয়াসমূহকে আমাদের আখিরাতের মঙ্গলের জন্য কবুল করেন ।

যা হোক, অসুস্থতার দ্বারা পরিচ্ছন্নতা লাভকারীর বিশেষ করে দুর্বলতা, অক্ষমতা, অসহায়ত্ব এবং প্রয়োজন থেকে করা দোয়া খুব বেশী গ্রহনযোগ্যতা লাভ করে । অসুস্থতা এরকম খালিস দোয়ার এক উসিল । দ্বীনদার রোগী ও রোগীর দেখাশোনাকারী মু'মীন ব্যক্তিগনের এই দোয়া থেকে লাভবান হওয়া দরকার ।

আঠারতম প্রতিষেধক

শুকরিয়া ত্যাগ করে অভিযোগে মগ্ন হে রোগী! অভিযোগ অধিকার থেকে আসে । তোমার কোন অধিকার খর্ব হয়নি যে অভিযোগ করেছ বরং তোমার শুকরিয়া আদায় করার অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু তুমি তা করনি । জনাব-ই হাকের হকসমূহ আদায় না করে অন্যায়ভাবে অভিযোগের সূরে হক দাবী করছ । তোমার চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকা কারও প্রতি তাকিয়ে অভিযোগ করতে পার না; বরং সুস্থতার দিক থেকে তোমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় পতিত অসহায়দের দিকে তাকিলে তোমার অবস্থার জন্য শুকরিয়া আদায় করতে তুমি বাধ্য । তোমার হাত ভাঙ্গা হলে, যার হাত নাই তাকে দেখ । তোমার এক চোখ না থাকলে দুই চক্ষুহীন অন্ধদের দেখ, আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় কর ।

নিয়ামতসমূহের ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে এমন কারও প্রতি লক্ষ্য করে কারও অভিযোগ করার অধিকার নেই । এবং মুসিবতের সময় প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে, নিজের চেয়ে বেশী অসুবিদা গ্রস্থদের প্রতি তাকিয়ে শুকরিয়া আদায়

করা। এই গভীর তাৎপর্যকে অনেক রিসালাতে এক উদাহরণের (মিসালের) দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে-

এক ব্যক্তি, একজন অসহায় লোককে এক মিনারের উপরে উঠায়। মিনারের প্রতি ধাপে আলাদা আলাদা ইহসান উপহার দেওয়া হয়। মিনারের একেবারে চূড়াঁয় সবচেয়ে ভাল উপহার দেওয়া হয়। ঐ সকল উপহারের বিনিময়ে শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা চাওয়া হচ্ছে কিন্তু ঐ জেদী লোক সকল ধাপে দেয়া হাদিয়াসমূহকে ভুলে অথবা কোন কিছুই নয় এরকম মনে করে শুকরিয়া আদায় না করে উপরের দিকে তাকায়। "যদি এই মিনার আরও উঁচু হত আরও উপরে পৌছাতাম। কেন মিনারটা ঐ পাহাড়সম নয় অথবা অপর মিনারের মত বেশী উঁচু নয়। এগুলো বলে যদি অভিযোগ শুরু করে তাহলে তার এ আচরণ কুবই অকৃতজ্ঞতা ও জুলুমের পরিচয় বহন করে। একজন মানুষ অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এসে পাথর, গাছ কিংবা পশু না হয়ে বরং মানুষ হয়ে মুসলমান হিসেবে অধিকাংশ সময় সুস্বাস্থ্য ও সবলতার মত সুউচ্চ নিয়ামতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় পরও ঐ নিয়ামত সমূহের যোগ্য না হওয়া অথবা অপ্রোয়োগ কিংবা অপব্যবহার করায় হাত ছাড়া হওয়া অথবা হাতের নাগালে না পাওয়ায় অভিযোগ করে ধৈর্য্যহীনতার পরিচয় দিয়ে "হায়! কেন আমি এটার মুখোমুখি হলাম!" বলা শারিরীক অসুস্থতা থেকে আরও বেশী মুসিবতপূর্ণ মানসিক এক অসুস্থতা। ভাঙ্গা হাত নিয়ে মারামারি করার মতো, অভিযোগের দ্বারা অসুস্থতাকে আরও বাড়িয়ে তুলে। বুদ্ধিমান কেউ,

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴾

আয়াতের গভীর মর্ম অনুধাবন করে আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করুক যাতে করে অসুস্থতা তার দায়িত্ব পালন করে চলে যেতে পারে ।

উনিশতম প্রতিষেধক

জামিল-ই যুলজালালের নামসমূহ যে সুন্দর তা "আসমাউল হুসনা" তাবির-ই সামাদানী দ্বারা বুঝা যায় । সকল সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে মনোরম, সুন্দর ও বৃহৎ আয়না-ই সামাদিয়াত হচ্ছে হায়াত । সুন্দরের আয়না নিজেও সুন্দর । সুন্দরের সৌন্দর্য ধারণকারী আয়না সুন্দর হয়ে উঠে । ঐ সুন্দর থেকে আয়নার যাই আসুকনা কেন তা যেমন সুন্দর তেমনি হায়াতের নিকটও যা আসে তাও সত্যিকার অর্থেই সুন্দর । কারণ, যে সুন্দর সে ঐ আসমাউল হুসনার সুন্দর শিল্পকর্মকেই তুলে ধরে ।

সুস্বাস্থ্য ও সবলতার দিক থেকে সর্বদা একই সরলরেখার উপর চললে তা অপরিপূর্ণ এক আয়নায় পরিণত হয় । হয়ত নিঃশেষতা, শূণ্যতা এবং অর্থহীনতাকে জাগিয়ে তোলে তাকে কষ্ট দেয় । হায়াতের মূল্যকে কমিয়ে দেয় ও জীবনের স্বাদকে বিস্বাদে পরিণত করে । নিজ সময়কে দ্রুত পার করার উদ্বিগ্নতা তেকে নিজেকে হয় অবৈদ ভোগবিলাসে অথবা ফুর্তিতে জড়িয়ে ফেলে । মূল্যবান জীবনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে জেলখানার সময়ের মত নিজ সময়কে দ্রুত পার করতে চায় ।

কিন্তু পরিবর্তনশীল, ঘটনাবহুল এবং নানা রকম হাল অবস্থার মধ্য দিয়ে ধাবিত হায়াত তার মূল্যকে জাগিয়ে তুলে অনুভব করায়, জীবনের গুরুত্ব ও স্বাদকে ফুটিয়ে তোলে । কষ্টে ও মুসিবতে পতিত হলেও সময় চলে যাক তা চায় না । এখনও সূর্য ডুবেনি, রাত এখনও শেষ হয়নি" বলে হা হুতাশ করে না ।

অতি ধনী, কর্মহীন ও আরামের বিছানায় অবস্থানকারী সকল দিক থেকে অবিভাবকহীন কাউকে জিজ্ঞাসা কর "কেমন আছো?" অবশ্যই আক্ষেপের সুরে বলবে "মোটেও সময় পার হচ্ছে না, আস, খেলার ব্যবস্থা করি কিংবা সময় কাটানোর জন্য আমোদ প্রমোদের আয়োজন করি।" অথবা অশেষ ও তীব্র আশা আকাংখা থেকে উদ্ভুত "আমার এ জিনিসটা নেই, যদি ঐ কাজটা করতে পারতাম" এর মত অভিযোগগুলোকে শুনতে পাবে।

মুসিবতগ্রস্থ অথবা শ্রমিক ও কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিতকারী একজন দারিদ্রকে জিজ্ঞাসা কর, "কি অবস্থা তোমার?" বুদ্ধিমান হলে বলবে, "আল্লাহর হাজারো শুকরিয়া, আমি ভালো আছি, কাজের মধ্যে আছি। দিনটা যদি তাড়াতাড়ী চলে না যেত, কাজটাও যদি শেষ করতে পারতাম। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। হায়াত থেকে থাকছে না, অতিবাহিত হয়ে চলে যাচ্ছে। এটা ঠিক যে আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু সেটাও একসময় শেষ হবে। সকল কিছু দ্রুত চলে যাচ্ছে।" জীবন সত্যিকার অর্থে কত মূল্যবান তা চলে যাওয়ার বেদনার দ্বারা জানাচ্ছে। অর্থাৎ কষ্ট ও শ্রমের দ্বারা জীবনের স্বাদ ও হায়াতের মূল্যকে অনুধাবন করছে। অপরদিকে অলসতা ও সুস্বাস্থ্য জীবনকে অতিষ্ট করে তুলে, দ্রুত অতিবাহিত হোক এমন কামনাই করে।

হে অসুস্থ ভাই! জেনে রেখ, অন্য রিসালাগুলোতে সুনিশ্চিত ও বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুসিবত, মন্দকিছু এমনকি গুনাহর আসল রূপ ও পরিচয় হল শূণ্যতা। আর শূণ্যতা হচ্ছে অন্ধকার। সর্বদা আরাম, নিশ্চুপতা, স্থিরতা, অচলতার মত অবস্থাগুলো শূণ্যতা ও অর্থহীনতার কাছাকাছি

হওয়ায় শূণ্যতার মাঝে বিরাজমান অন্ধকারকে ফুটিয়ে তুলে কষ্ট দেয়। কর্মশীলতা ও পরিবর্তনশীলতাই হচ্ছে জীবন যা প্রাণের অস্তিত্ব বহন করে। সৃষ্টিই হচ্ছে আসল কল্যাণ ও নূর।

মহাসত্য যেহেতু এই সেহেতু তোমার মাঝে বিরাজমান অসুস্থতাকে; মুল্যবান হায়াতকে পরিচ্ছন্ন, শক্তিশালী, উন্নত ও দেহের বিভন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঐ অসুস্থ অঙ্গের সহযোগীতায় ধাবিত করতে এবং সানি-ই হাকীমের বিভিন্ন নামের শৈল্পিকতাকে দেখানোর মত নানা ধরনের দায়িত্ব দিয়ে তোমার দেহে মুসাফির হিসেবে পাঠানো হয়েছে। ইনশাল্লাহ দ্রুত দায়িত্ব শেষ করে চলে যাবে এবং বিদায়লগ্নে সুস্থতাকে বলবে "তুমি এখন আস, আমার পরিবর্তে সর্বদা এখানে অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করো। এই দেহ তোমার, এখানে ভালো থাকে।"

বিশতম প্রতিষেধক

কষ্ট থেকে মুক্তি লাভে উদগ্রীব হে রোগী! অসুস্থতা দুই ধরনের হাকিকি ও ধারণাপ্রসুত।

হাকিকি রোগসমূহ ঃ শাফি-ই হাকিম- যুলজালাল ভূপৃষ্ঠকে বিশাল এক ঔষধালয় হিসেবে সৃষ্টি করে সবধরনের রোগের ঔষধের ব্যবস্থা এখানে করেছেন। এই ঔষধগুলো যেহেতু আছে তেমনি অসুস্থতাও আছে। আল্লাহ প্রত্যেক রোগের জন্য আলাদা আলাদা মুক্তির উপায় বাতলে দিয়েছেন। চিকিৎসার জন্য ঔষধগুলিকে ক্রয় করে ব্যবহার করা জায়েয কিন্তু ঔষধের সফলতা ও রোগীর সুস্থতা লাভ যে শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত তা জানা দরকার। অসুস্থতা যেমন দিয়েছেন সুস্থতাও তিনি দিবেন।

বিশেষজ্ঞ, দ্বীনদার চিকিৎসকের উপদেশগুলোকে মেনে চলাও গুরুত্বপূর্ণ এক ঔষধ। কারণ, অধিকাংশ অসুস্থতা

অপব্যবহার, অপরিমিত ভোগ, অপব্যয়, ভুলত্রুটি, অবৈধ ভোগবিলাস এবং অসাবধানতার কারণে হয়ে থাকে। দ্বীনদার চিকিৎসক হালাল পরিদির মাঝে তেকে নাসিহাত ও উপদেশ দিয়ে থাকে। অপব্যবহার ও অপব্যয় থেকে বিরত রেখে সান্ত্বনাবাণী গ্রহণ করলে অসুস্থতা কমে আসে; কষ্টের পরিবর্তে শান্তি লাভ করে।

ধারণাপ্রসূত (অমূলক) রোগসমূহঃ ধারণাপ্রসূত অসুখসমূহ থেকে মুক্তির সবচেয়ে সফল ঔষধ হচ্ছে এ ধরনের অসুস্থতাকে গুরুত্ব না দেয়া। গুরুত্ব দিয়ে থাকলে তা বড় ও প্রসারিত হতে থাকে। গুরুত্ব না দিলে তা ছোট হয়ে আসে এবং ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যায়। যেমন মৌমাছিকে ধাওয়া করলে তা কামড় দেয়, কিছু না করলে চলে যায়। অন্ধকারে চোখের সামনে দুলতে থাকা কান সুতাকে গুরুত্ব দিলে সে আরো প্রসার লাভ করে। এমনকি তাকে পাগলের মত পালাতে বাধ্য করে। গুরুত্ব না দিলে সামান্য এক টুকরা সূতা যে সাপ নয় তা বুঝতে পারে, শুরুতে যে ভয় পেয়েছিল তা নিয়ে হাসে।

ধারণাপ্রসূত অসুস্থতা এভাবে চলতে থাকলে তা এক সময় প্রকৃত রোগে পরিণত হয়। অতিমাত্রায় সন্দেহপ্রবন ও উগ্র মেজাজী মানুষদের জন্য তা খুব খারাপ এক রোগ যা তিলকে তাল করে। ফলশ্রুতিতে মানসিক শক্তি লোপ পায়। বিশেষত দয়াহীন হাতুড়ে ডাক্তার অথবা ইনসাফহীন চিকিৎসকদের মুখোমুখী হলে তার ঐ ব্যধি আরও বৃদ্ধি পায়। ধনী হলে সম্পদ খরচ হয় অন্যথায় আকল না হয় স্বাস্থ্য হারায়।

হে অসুস্থ ভাই! তোমার অসুস্থতায় কষ্ট আছে কিন্তু ঐ কষ্ট দুরীভূত করবে এমন গুরুত্বপূর্ণ এক লজ্জতও তোমাকে

ঘিরে আছে। কারণ বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজন যদি থাকে তাহলে অনেক দিন ধরে ভুলে থাকা অতি লজ্জতময় মমতা আবার তোমার চারিপাশে নতুন করে জেগে ইঠবে, শিশুকালে যে ভালবাসা পেয়েছিলো সেগুলোকে আবার নতুনভাবে পাবে। একই সাথে অতি গোপন ও পর্দার আড়ালে রয়ে যাওয়া বন্ধুত্ব অসুস্থতার আকর্ষণে আবারো জেগে উঠে এবং তোমার প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকানোর ফলে তোমার ঐ কষ্ট অনেকটাই হ্রাস পায়। অধিকন্তু, তুমি গর্বের সাথে যাদের খেদমত করেছ ও প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করেছ তারাই তোমার অসুস্থতার কারনে দয়াপরবশ হয়ে তোমার খেদমত করায় তুমি তোমার প্রভুর প্রভু হয়ে উঠলে। আবার, ইনসানের মাঝে বিদ্যমান "সমগোত্রভুক্তদের প্রতি সহানুভূতি" এবং "একই শ্রেণীয অন্তর্ভুক্তদের প্রতি শাফকাত" কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করায় তুমি অনেক সহযোগী বন্ধু ও শাফকাতময় দোস্ত পেয়েছ। একই সঙ্গে, অতি কষ্টের খেদমতসমূহ তেকে রেহাই পেয়েছ ও আরাম করছ।

তাহলে, উল্লেখিত লজ্জতসমূহের কারণে এই আংশিক কষ্ট অবশ্যই তোমাকে নালিশের দিকে নং বরং শুকরিয়ার দিতে ধাবিত করে।

বাইশতম পরিষেধক

পক্ষাঘাতের মত কঠিন রোগে আক্রান্ত হে ভাই! সর্বাগ্রে আমি তোমাকে সুসংবাদ প্রদান করছি যে মুমিনের জন্য পক্ষাঘাত রোগ মুবারক রোগ হিসেবে গন্য করা হয়। আউলিয়াদের নিকট থেকে অনেক দিন ধরেই এ সম্পর্কে শুনে আসছিলাম কিন্তু তাৎপর্যটা জানতাম না। এটার একটি মর্ম আমার কালবে

আসলঃ আল্লাহর দোস্তগণ জনাব-ই হাকের গভীর নৈকট্য লাভ, বড় বড় আধ্যাত্মিক মসিবত থেকে মুক্তি এবং চিরন্তন শান্তি লাভের জন্য প্রদানত দুইটি বিষয়কে স্বেচ্ছায় অনুসরণ করে এসেছে।

প্রথমতঃ রাবিতা-ই মউত। অর্থাৎ "দুনিয়া যেমন ফানি তেমনি দুনিয়ার মাঝে নিজেও দায়িত্ব প্রাপ্ত ফানি এক মুসাফির" হিসেবে চিন্তা করার মধ্য দিয়ে হায়াত-ই আবাদিয়ার (চিরস্থায়ী হায়াতের) জন্য কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন।

দ্বিতীয়তঃ নাফস-ই আম্মারা ও তীব্র আকাংখা থেকে উদ্ভুত বিপদসমূহ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কষ্ট ভোগ ও রিয়াযতের দ্বারা নাফস-ই আম্মারাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে গেছেন।

দেহের অর্ধেক অবশ হয়ে যাওয়া হে ভাই! তুমি না চাইলেও সংক্ষিপ্ত, সহজ ও শান্তির উসিলা হিসেবে দুটি আসল জিনিস তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। তোমার শারীরিক অবস্থা সর্বদা তোমাকে দুনিয়ার নশ্বরতা এবং ইনসানের ক্ষণস্থায়িত্ব সতর্কতার সাথে স্মরণ করাচ্ছে। দুনিয়া তোমাকে শ্বাসরুদ্ধ করতে পারছেনা, গাফলত তোমাকে অন্ধ করতে পারছে না। নাফস-ই আম্মারা অর্ধ মানুষ হিসেবে গণ্য ব্যক্তিকে নোংরা খায়েশ এবং নাফসের পছন্দনীয় কিছু দ্বারা অবশ্যই প্ররোচিত করতে পারে না। নাফসের মুসিবত থেকে দ্রুত মুক্তি লাভ করে।

অতএব, মুমিন ঈমানের গভীর মর্ম, তাসলিমিয়াত (আত্মসমর্পন) এবং তাওয়াক্কুলের দ্বারা পক্ষাঘাতের মত কঠিন রোগ থেকে খুব অল্প সময়ে আওরিয়াদের কষ্টের মত লাভবান হতে পারে। এমনি অবস্থায় ঐ কঠিন অসুখের মূল্য অনেক কমে যায়।

তেইশতম প্রতিষেধক

হে সঙ্গীহীন, অসহায় ও উপায়হীন রোগী! অসুস্থতার পাশাপাশি তোমার নিঃসঙ্গতা ও প্রবাস জীবন, যদি কঠিন কালবের অধিকারীদের ব্যতিত এবং তাদের মমতার দৃষ্টিকে আকর্ষন করে তাহলে কুরআনের সকল সূরার প্রথমে নিজেকে “রাহমানুর রাহীম” হিসেবে উপস্থাপনকারী, শাফকাতের একটি ঝলকের মাধ্যমে সমস্ত শিশুকে মাতাদের তুলনাহীন মমতার দ্বারা লালন-পালন করিয়ে নেয়া স্বত্তা, প্রত্যেক বসন্তে অসীম রহমতের দ্বারা ভূপৃষ্ঠকে পরিপূর্ণকারী এবং চিরন্তন হায়াতে অশেষ রহমতের প্রতিফলন হিসেবে সমস্ত সৌন্দর্যের আধার জান্নাতের মালিক খালিক-ই রাহীমের (দয়াময় স্রষ্টার) সাথে ঈমানের দ্বারা সংযোগ ও তাঁকে জেনে অসুস্থতা থেকে উদ্ভুত অসহায়ত্বের ভাষায় তার নিকট দোয়া এবং প্রবাসে তোমার সিঃসঙ্গ অসুস্থতা, অতি মূল্যবান তাঁর রহমতের দৃষ্টি তোমার প্রতি অবশ্যই আকৃষ্ট করবে। যেহেতু তিনি আছেন সেহেতু তোমার যত্ন করবেন ও তোমার জন্য সবকিছুই রয়েছে। সত্যিকার প্রবাসী ও নিঃসঙ্গ হলো সে, যে ঈমান ও তাসলিমিয়াতের (আত্মসমর্পনের) দ্বারা আল্লাহর সাথে গভীর সংযোগ গড়ে তুলে না কিংবা একে গুরুত্ব দেয় না।

চব্বিশতম প্রতিষেধক

নিষ্পাপ অসুস্থ শিশুদের এবং ঐ নিষ্পাপ শিশুসম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খেদমতের নিয়োজিত হে পরিচর্যাকারীগণ! তোমাদের জন্য আখিরাত সম্পর্কিত খুবই লাভজনক এক ব্যবসা রয়েছে। আগ্রহ ও প্রচেষ্টার দ্বারা ঐ ব্যবসায় সফলতা অর্জন কর।

মাসুম শিশুদের রোগসমূহ ঐ নাজুক দেহের জন্য এক অনুশীলন, রিয়াযত এবং ভবিষ্যতে দুনিয়ার দুঃখ কষ্টের সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার জন্য এক ধরনের প্রতিষেধক এবং তারবিয়া-ই রাব্বানী (রাব্বানী প্রশিক্ষণ) । একই সাথে দুনিয়ার হায়াত সম্পর্কিত অনেকগুলো হিকমতকে বহনের পাশাপাশি (বড়দের হায়াত-ই রূহানী ও তাসাফ্ফী-ই হায়াতের উসিলা কাফফারাতুয্যুনুব এর পরিবর্তে) শিশুর ভবিষ্যত জীবনে অথবা আখেরাতে মর্তবা লাভেরও উপায় আর এ অসুস্থতা থেকে আসা সওয়াব বাবা ও মায়ের আমলনামায়, বিশেষত গভীর মমতার দ্বারা শিশুর সুস্থতাকে নিজ সুস্থতার উপর স্থান প্রদানকারী মায়ের আমলনামায় যে লিপিবদ্ধ করা হয় তা আউলিয়াদের (আহলি হাকিকাতের) সাক্ষ্য দ্বারা সুনির্দিষ্ট ।

আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খেদমত করার মাধ্যমে বিশাল সওয়াব অর্জনের পাশাপাশি ঐ বয়স্কদের (বিশেষত বাবা ও মায়ের) দোয়া পাওয়া ও তাদেরকে খুশি করা এবং নিষ্ঠার সাথে তাদের খেদমত করা যে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তির অন্যতম উসিলা তা সহিহ রিওয়ায়েত এবং ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা সুনির্দিষ্ট । বৃদ্ধ পিতা-মাতার পূর্ণ অনুগত সৌভাগ্যবান সন্তান যেমন নিজ সন্তানের কাছ থেকে একই সম্মান পায় তেমনি পিতামাতাকে কষ্টদানকারী দূর্ভাগ্য সন্তান আখরী আযাবের পাশাপাশি দুনিয়াতেও যে বহু মুসিবতের মাধ্যমে শাস্তি ভোগ করে তা বহু ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত ।

বৃদ্ধদের ও মাসুম শিশুদের খেদমত শুধু আত্মীয়দের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং যদি ঐ মুহতারাম অসুস্থ বৃদ্ধদের সাথে কোন ঈমানদারের (যেহেতু ঈমানের গভীর তাৎপর্য অনুযায়ী হাকিকি

ভ্রাতৃত্ব রয়েছে) দেখা যায় এবং ঐ বৃদ্ধরা যদি তার মুক্ষাপেক্ষী হয় তাহলে ঈমানের গভীর তাৎপর্য থেকে উদ্ভুত হাকিকি ভ্রাতৃত্বের দাবী অনুযায়ী জান-প্রাণ দিয়ে তাদের খেদমত করা ইসলামিয়াতের অন্যতম শর্ত ।

পঁচিশতম প্রতিষেধক

হে অসুস্থ ভাইয়েরা! যদি তোমরা অতি লাভজনক ও সকল সমস্যার সমাধানকারী এবং সুস্বাদু পবিত্র প্রতিষেধক চাও তাহলে তোমাদের ঈমানকে মজবুত কর । অর্থাৎ তওবা ও ইসতিগফার এবং নামায ও ইবাদতের মাধ্যমে ঐ পবিত্র প্রতিষেধক ঈমানকে আরো শক্ত করা এবং তা থেকে উদ্ভুত ঔষধসমূহকে ব্যবহার কর ।

দুনিয়ার প্রতি মহব্বত ও আসক্তির কারণে গাফলতে নিমজ্জিতদের (আহলি গাফলতের) দুনিয়ার মত বিশাল, রুগ্ন রূপক এক দেহ রয়েছে । রিসালা-ই নূরের অনেক জায়গায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেছি যে, ঈমান নিঃশেষ ও বিচ্ছিন্নতার আঘাতে জর্জরিত এবং ক্ষত-বিক্ষত ঐ রূপক দেহকে রোগসমূহ থেকে মুক্ত করে প্রকৃত সুস্থতা ফিরিয়ে দেয় । তোমাদের কষ্ট না দেওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত করছি ।

ফরযসমূহকে যথাসম্ভব আদায় করার মাধ্যমে ঈমান নামক ঔষধের ফলাফল পাওয়া যায় । গাফলতি, নিষিদ্ধ ভোগবিলাস, নাফসের খায়েশসমূহ এবং অবৈধ আনন্দ ঐ ঔষধের ফল প্রদানে বাঁধা হয়ে দাড়ায় । অসুস্থতা যেহেতু গাফলতকে দূর করে, ভোগের আকাংখাকে নিঃশেষ করে এবং অবৈধ ভোগবিলাসে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সেহেতু তা থেকে বিশেষবাবে লাভবান হও ।

হাকিকি ঈমানের পবিত্র ঔষধসমূহ ও নূরসমূহকে তওবা ও ইসতিগফার এবং দোয়া ও নিয়াজের দ্বারা ব্যবহার কর ।

জনাব-ই হাক তোমাদেরকে শিফা প্রদান করুক, তোমাদের রোগসমূহকে কাফফারাতুযযুনুব (গুনাহ মাফের উসিলা) করুক । আমিন, আমিন, আমিন ।

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾

﴿ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوائِهَا، وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُورِ الْأَبْصارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

শিশু তাযিয়ানামা
(১৭তম মাকতুবাত)

بِاسْمِهِ

﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾

মুহতারাম দ্বীনি ভাই জনাব হাফিজ খালিদ,

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

প্রিয় ভাই, তোমার সন্তানের মৃত্যু আমাকে ব্যথিত করেছে কিন্তু اَلْحُكْمُ لِلَّهِ ভাগ্যকের বরন এবং কদরের নিকট আত্মসমর্পন ইসলামের অন্যতম একটি নীতি। জনাব-ই হাক তোমাদের সবাইকে সবর-ই জামিল দান করুন। মরহুমকে তোমাদের জন্য আখিরাতের সম্বল ও শাফায়াতকারীতে পরিণত করুন। তোমাদেরকে এবং তোমাদের মত মুত্তাকী মুমিনদেরকে বড় এক সুসংবাদ ও হাকিকি সান্তনা দেবে এমন পাঁচটি পয়েন্ট তুলে ধরছি-

প্রথম পয়েন্ট

কুরআন-ই হাকীমের আয়াত ﴿وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ এর গভীর অর্থ ও মর্ম হল-

মুমিনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সন্তান জান্নাতে চিরস্থায়ী, আকর্ষণীয়, জান্নাতের উপযোগী অবস্থায়

চিরজীবন শিশু হিসেবে অবস্থান করবে। জান্নাতে প্রবেশকারী বাবা ও মায়ের কোলে চিরস্থায়ী প্রফুল্লের উসিলা হবে এবং বাবা-মায়ের শিশুকে আদর ও স্নেহ করার মত নির্মল আনন্দ উপভোগেরও কারণ হবে। আনন্দের সকল কিছুই জান্নাতে বিদ্যমান। "জান্নাত বংশবৃদ্ধির জায়গা না হওয়ায় জান্নাতে সন্তানকেআদর ও স্নেহ করারও সুযোগ নেই" বলে যারা দাবী করছে তাদের দাবী যে সঠিক নয় এবং দুনিয়াতে নানা দুঃখ কষ্টের মাঝে দশ বছরের মত স্বল্প সময়ের জন্য সন্তানকে আদর করা ও ভালবাসার পরিবর্তে ব্যথা বেদনাহীন কোটি কোটি বছর ধরে সন্তানকে ভালবাসা ও আদরের সুযোগ লাভ করা যে ঈমানদারদের (আহলি ঈমানের) সবচেয়ে বড় শান্তি তা আয়াত-ই কারিমার ﴿ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴾ অংশটুকু দ্বারা সুসংবাদ হিসেবে দেয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট

একদা এক ব্যক্তি জেলখানায় অবস্থান করছিল। তার স্নেহ পরায়ন সন্তানকে তার নিকট পাঠানো হলো। উপায়হীন কয়েদি একদিকে নিজের কষ্টে জর্জরিত হচ্ছিল অপরদিকে সন্তানের আরামের ব্যবস্থা করতে না পারার ব্যথাও তাকে ব্যথিত করছিল। পরবর্তীতে রহমতের অধিকারী বিচারক (বাদশাহ) ঐ বন্দীর নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন, "এই শিশুটি সত্যিকার অর্থেই তোমার সন্তান কিন্তু সে আমার প্রজা ও মিল্লাতেরও সদস্য। তাকে আমি নিয়ে যাব এবং সুন্দর এক রাজ প্রাসাদে লালন-পালন করব।"

ঐ কয়েদী ক্রন্দনরত অবস্থায় বলল, "আমার সান্তনার একমাত্র অবলম্বন এই সন্তানকে আমি দিব না।"

বন্দীর বন্ধুরা তাকে বলল, "তোমার এই দুঃখানুভব অর্থহীন। তুমি যদি তোমার সন্তানের সত্যিকার অর্থেই কল্যান চাও তাহলে জেনে রাখ, শিশুটি এই নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ও কষ্টে ভরা জেলখানা থেকে আরামদায়ক ও শান্তিময় এক প্রাসাদে যাবে। অপরদিকে তুমি যদি নিজের নাফসের কারণে ব্যথিত হয়ে নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তোমার সন্তানকে এখানে রেখে দাও তাহলে ক্ষণস্থায়ী সন্দেহজনক এক স্বার্থের পাশাপাশি শিশু কঠিন পরিবেশে অবস্থান করায় খুব বেশী কষ্ট ও বেদনা ভোগ করবে। কিন্তু শিশু যদি সেখানে যায় তাহলে তোমার হাজার গুন বেশী লাভ হবে কারণ সে সেখানে যায় তাহলে তোমার হাজার গুন বেশী লাভ হবে কারণ সে বাদশাহর রহমত হাসিল করার উসিলা হওয়ায় তোমার জন্য শাফায়াতকারী হবে। বাদশাহ ঐ শিশুর সাথে তোমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করাতে আগ্রহী হবেন। অবশ্যই সাক্ষাতের জন্য তাকে জেলখানায় পাঠাবেন না বরং তোমাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে ঐ রাজ প্রাসাদে নিয়ে শিশুর সাথে সাক্ষাত করাবেন। তবে শর্ত হচ্ছে, বাদশাহর প্রতি তোমার বিশ্বাস ও আনুগত্য থাকতে হবে।"

প্রিয় ভাই, তোমার মত মুমিনদের সন্তানের ওফাতের সময় উপরে বর্ণিত গল্পের ন্যায় চিন্তা করা দরকার-

এই সন্তান হচ্ছে মাসুম। তার স্রষ্টাও অসীম রহমত ও দয়ার অধিকারী। তিনি আমার সন্তানকে আমার অপরিপূর্ণ ইনায়েত (সাহায্য) ও রহমতের অধিকারী করলেন। আল্লাহ দুঃখময়, মুসিবতে পরিপূর্ণ, কষ্টময় দুনিয়ার জেলখানা তেকে বের করে তাকে জান্নাতুল ফিদৌসে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শিশুর জন্য তা কতই না আনন্দের! এই দুনিয়াতে থাকলে

না জানি সে কোন ধরনের মানুষ হতো! এ জন্যই আমি তার জন্য দুঃখবোধ করছিনা, আমি তাকে সুখী হিসেবেই জানি। এমনকি আমার নাফসের স্বার্থের জন্যও আমি দুঃখিত ও ব্যথায় ভারাক্রান্ত নই। কারন দুনিয়াতে থাকলে ভালো-মন্দ মিলিয়ে দশ বছরের ক্ষণস্থায়ী মহব্বতের অধিকারী হতাম। যদি সে সালিহ এবং দুনিয়াবী কাজকর্মে সফল হতো তাহলে আমাকে সাহায্য করতো কিন্তু ওফাতের মাধ্যমে চিরস্থায়ী জান্নাতে কোটি বছর ধরে আমার সন্তান-স্নেহের ওসিলা এবং চিরস্থায়ী শান্তির জন্য শাফায়াতকারী হবে। অনিশ্চিত এক নগদ স্বার্থ হারিয়ে যে সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী নিরাশ হয়ে ফরিয়াদও করবে না।

তৃতীয় পয়েন্ট

মৃত্যু বরণকারী শিশু খালিক-ই রাহীমের (দয়াময় স্রষ্টার) এক মাখলুক, গোলাম ও বান্দাহ। তার সব কিছুই ঐ শিল্পীর শিল্প। শিশুকে ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য মা-বাবার সংরক্ষণে বন্ধুরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ মা ও বাবাকে তার খেদমতকারী বানিয়েছেন। ঐ খেদমতের নগদ মূল্য হিসেবে তাদেরকে অতি স্বাদের এক শাফকাত প্রদান করেছেন।

এখন, হাজার হিস্যার মধ্যে নয়শ নিরানব্বই হিস্যার অধিকারী ঐ খালিক-ই রাহীম (দয়াময় স্রষ্টা) রহমত ও হিকমতের কারনে শিশুটিকে যদি তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেয় এবং তোমার খেদমতের সমাপ্তি ঘটায় তাহলে কৃত্রিম এক হিস্যার অধিকারী হয়ে হাজার হিস্যার অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে আশাহত হয়ে দুঃখ প্রকাশ ও ফরিয়াদ করা ঈমানদারদের (আহলি ঈমান) শোভা পায় না। ফরিয়াদ কেবল গাফলত ও দালালতে নিমজ্জিতদেরই শোভা পায়।

চতুর্থ পয়েন্ট

যদি দুনিয়া অবিনশ্বর হত, মানুষ তার বুকে চিরকাল থ াকতো এবং বিচ্ছিন্নতা চিরস্থায়ি হত তাহলে তোমার দুঃখে জর্জরিত হওয়া ও হতাশ হয়ে ফরিয়াদ করার অর্থ হত। কিন্তু দুনিয়া হচ্ছে মুসাফিরখানা, মৃত্যু বরণকারী শিশুটি যেখানে গেছে তোমরা ও আমারও সেখানে যাব।

এই মৃত্যু শুধু তার জন্য প্রযোজ্য নয় বরং তা সবার জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। আবার যেহেতু বিচ্ছিন্ন চিরকালের জন্য নয়, আগামীতে বারযাহ ও জান্নাতে সাক্ষাত করানো হবে সেহেত اَلْحُكْمُ لِلّٰهِ বলা দরকার। "তিনি দিয়েছিরেন আবার তিনিই নিয়ে গেছেন।" "আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল" বলে সবরের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করাও আমাদের দায়িত্ব।

পঞ্চম পয়েন্ট

ইলাহী রহমতের সবচেয়ে মোলায়েম, সুন্দর, আকর্ষণীয় ও মনোরম প্রতিফলনগুলো থেকে উদ্ভুত শাফকাত, নূরানী এক প্রতিষেধক যা আশ্‌ক (প্রেম) থেকেও ধারালো। শাফকাত জনাব-ই হাকের নিকট দ্রুত পৌছানোর উসিলাও বটে। আশ্‌ক-ই হাকিকিতে রূপান্তরিত হয়, জনাব-ই হাককে খুঁজে পায়। শাফকাত কিন্তু কোন রকমের মুসকিল ছাড়াই আরো সংক্ষিপ্ত ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে কালবকে জনাব-ই হাকের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

বাবা ও মা দুজনই সন্তানকে দুনিয়ার অন্য সবার মতই ভালবাসে। সন্তানকে যখন তার নিকট তেকে নিয়ে নেয়া হয় তখন সে যদি সৌভাগ্যবান হাকিকি ঈমানদার (আহলি ঈমান)

হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং মুনিম-ই হাকিকিকে (আসল নিয়ামতদাতাকে) খুঁজে পায়। "দুনিয়া যেহেতু ক্ষণস্থায়ী সেহেতু তার প্রতি হৃদয়ে দুর্বলতা (আকর্ষণ) থাকা অর্থহীন" বলে সন্তান যেখানে গেছে সেখানের সাথে এক ধরনের সংযোগ তৈরী করে, আধ্যাত্মিকতায় গভীরতা অর্জন করে।

গাফলত ও দালালতে নিমজ্জিতরা এই পাঁচ হাকিকাতের মাঝে নিমজ্জিত, দুনিয়াকে চিরস্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে কল্পনাকারী কোন বৃদ্ধা, মৃত্যুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ও চির বিচ্ছেদ মনে করায় অতি আদরের একমাত্র সন্তানের মুমূর্ষ অবস্থায় নরম বিছানার পরিবর্তে কবরের মাটির বিছানার কতা ভেবে গাফলতও দালালতের কারণেরাহমানির রাহিমের জান্নাতের রহমত ও ফেরদৌসের নিয়ামতগুলোকে অনুধাবন না করে আশাহীনতার মাঝে কি পরিমাণ দুঃখ ও কষ্ট অনুবব করছে তা তুমিই তুলনা কর।

কিন্তু দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের শান্তির উসিলা ঈমান ও ইসলাম মুমিনকে বলেঃ মৃত্যু শয্যায় শায়িত এ শিশুটির খালিক-ই রাহীম (দয়াময় স্রষ্টা) তাকে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বের করে চিরস্থায়ী জান্নাতে নিয়ে যাবে। একই সঙ্গে তাকে তোমার শাফায়াতকারী এবং অনন্তকালের জন্য তোমার সন্তান বানিয়ে দেবে। বিচ্ছিন্নতা সাময়িক, চিন্তা করো না। اَلْحُكْمُ لِلّٰهِ

﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ বল, শুকরিয়া আদায় করো।

اَلْبَاقِي هُوَ الْبَاقِي

সাইদ নূরসী

হযরত আইয়ুব (আঃ) এর মুনাজাত
(দ্বিতীয় লেমা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴾

ধৈর্য্যের বীর হযরত আইয়ুব (আঃ) এর এই মুনাজাত খুবই পরীক্ষিত এবং ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী। তাই এ আয়াত থেকে ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের মুনাজাতেও

رَبَّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

বলা দরকার।

হযরত আইয়ুব (আঃ) এর মশহুর ঘটনার সার সংক্ষেপ হলোঃ দীর্ঘ সময় ধরে কুষ্ঠ রোগে ভুগলেও ঐ অসুস্থতার বিশাল পুরস্কারের কথা চিন্তা করে পরিপূর্ণ সবরের সাথে সহ্য করেছেন। পরবর্তীতে ঐ ক্ষতগুলো থেকে উদ্ভুত পোকাগুলো যিকির ও মারিফাত-ই ইলাহীয়ার (আল্লাহকে জানার) স্থান কালব ও জিহ্বাকে আক্রমন করায় নিজের আরাম-আয়েশের জন্য নয় বরং ইবাদত বন্দেগী ক্ষতিগ্রস্থ হবে চিন্তা করে বললেনঃ "ইয়া রব, আমি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। জিহ্বার কারণে যিকির এবং কালবের কারণে আমার ইবাদত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।" জনাব-ই হাক ঐ খালিস, পরিচ্ছন্ন, ক্রোধহীন এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির

জন্য করা দোয়াকে অতি চমৎকারভাবে কবুল করেছেন, পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে তাকে নানা রহমতের মুখোমুখি করেছেন।

এই লেমাতে পাঁচটি গভীর তাৎপর্য বিদ্যমান-

প্রথম তাৎপর্য

হযরত আইয়ুব (আঃ) এর বাহ্যিক ব্যাধিগুলোর অনুরূপ আমাদেরও অভ্যন্তরীণ, রূহানী এবং কালবী ব্যধি রয়েছে। ভিতরকে বাহিরে আর বাহিরকে ভিতরে নেয়া হলে আমাদেরকে হযরত আইয়ুব (আ:) এর চেয়ে অনেক বেশী ব্যধিগ্রস্থ হিসেবে দেখা যাবে। কারণ, আমাদের প্রতিটি গুনাহ ও মনের ভিতরে জেগে উঠা প্রতিটি সন্দেহ আমাদের কালব ও রূহে ক্ষতের সৃষ্টি করে। হযরত আইয়ুব (আ:) এর ব্যধিগুলো তাঁর ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী হায়াতকে বিপদগ্রস্থ করছিল। আমাদের এই আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ সুদীর্ঘ হায়াত-ই আবাদিয়াকে (অনন্ত জীবনকে) বিপদগ্রস্থ করে তুলেছে। সুতরাং আমরা ঐ মুনাজাত-ই আইয়ুবিয়ার প্রতি হযরত আইয়ুব (আঃ) চেয়ে হাজারগুন বেশী মুখাপেক্ষী।

বিমেষত যেখাবে হযরত আইয়ুব (আঃ) এর ক্ষতসমূহ থেকে উদ্ভুত পোকা কালব ও জিহবাকে আক্রমন করেছিল তেমনি গুণাহসমূহ থেকে উদ্ভুত ব্যাধি এবং ব্যাধিগুলো থেকে আসা ওয়াসওয়াসা, সন্দেহ (নাউজুবিল্লাহ) ঈমানের কেন্দ্রস্থল কালবকে আক্রমণ করে ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এবং ঈমানকে ফুটিয়ে তোলার বাহন জিহ্বার রূহানী আনন্দকে হামলার দ্বারা ঘৃণার উদ্রেক করে যিকির থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে আমদেরকেও স্তব্ধ করে দিচ্ছে।

গুনাহর দ্বারা কালব কালো হতে থাকে এবং নূর-ই ঈমান উবে গিয়ে কালব শক্ত হয়ে যায়। প্রতৌক গুনাহতে কুফুরীতে যাওযার একটি পথ বিদ্যমান। ঐ গুনাহ ইসতিগফারের দ্বারা অতিদ্রুত ধ্বংস না করা হলে পোকা নয় বরং তা ছোট একটি সাপ হিসেবে কালবকে দংশন করে।

উদাহরণ স্বরূপ

১. গোপনে লজ্জাজনক কোন গুণাহ সম্পাদনকারী ব্যক্তি গুনাহটি অন্য কেউ জানলে ব্যাথিত হওয়ায় মালাইকা ও রূহানিয়াতের অস্তিত্ব তার কাছে অসহ্য মনে হয়। ছোট কোন উসিলা (লক্ষণ) পেলেই তাদেরকে অস্বীকার করার আকাংখা প্রকাশ করে।

২. জাহান্নামের মুখোমুকি হতে হবে এমন বড় কোন গুনাহ সম্পাদনকারী ব্যক্তি জাহান্নামের ভীতিকে অনুভব করার সাথে সাতে ইসতিগফারের দ্বারা তার বিরুদ্ধে অবস্থান না নিলে সমস্ত মনপ্রান দিয়ে জাহান্নামের ধ্বংস কামনা করে। ছোট কোন লক্ষণ (উসিলা) ও সন্দেহ জাহান্নামকে অস্বীকার করতে সাহস জোগায়।

৩. ফরজ নামায ত্যাগকারী এবং ইবাদতের প্রতি উদাসীন ব্যক্তি ছোট কোন কাজ সম্পাদন না করার কারণে ছোট কর্মকর্তার নিকট থেকে সতর্কবাণী শুনে ব্যতিত হওয়ায় অনাদি ও অনন্ত কুদরতের অধিকারী আল্লাহ তায়ালার পুনঃ পুন নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ফরজগুলোতে অলসতা তাকে খুবই কষ্ট দেয়। এই কষ্ট তেকে আকাংখার সুরে বলে “ইবাদত যদি না থাকত” এবং আকাংখা তেকে উদ্ভুত ইলাহী শত্রুতা তার মাঝে অস্বীকারের প্রবণতা জাগিয়ে তুলে। আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি সন্দেহ

কালবে আসলে তাকে সুনির্দিষ্ট দলির বলে আঁকড়ে ধরে; বৃহৎ এক ধ্বংসের দারপ্রান্তে পৌঁছে। ইবাদত থেকে অতি সামান্য কষ্টের মুখোমুখি হয় কিন্তু অস্বীকারের দ্বারা নিজেকে যে ঐ কষ্টের চেয়ে আরও কোটি কোটি পরিমান ভয়ংকর কষ্টের দিকে ধাবিত করছে দুর্ভাগ্য তা বুঝতে পারে না। মাছির কামড় থেকে পালিয়ে সাপের কামড় খেতে রাজী হয়। অনুরূপ সব কিছু উপরোক্ত তিন ব্যাখ্যার সাথে তুলনা করা হোক যাতে ﴿ بَلۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ﴾ এর তাৎপর্য বোধগম্য হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য

২৬ তম বাণীতে কদরের তাৎপর্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মুসিবত ও অসুস্থতায় পতিত মানুষের তিনটি কারণে অভিযোগ করার কোন অধিকার নেইঃ

প্রথমত কারণ ঃ জনাব-ই হাক ইনসানকে দেহ নামক যে পোষাক পরিয়েছেন সেটিকে শৈল্পিকতায় পরিপূর্ণ করে তাকে মডেল বানিয়েছেন। দেহ নামক পোশাককে মডেলের উপর কেটে, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে আসমাউল হুসনার প্রতিফলন দেখায়। শাফী নামের প্রতিফলনের জন্য যেমন অসুস্থতা অনিবার্য তেমনি রাজ্জাক নামের প্রতিফলনের জন্যও ক্ষুধা অনিবার্য। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার অন্য নামগুলোও চিন্তা করা যেতে পারে।

مَالِكُ الْمُلْكِ يَتَصَرَّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ

দ্বিতীয় কারণঃ হায়াত মুসিবত ও অসুস্থতার দ্বারা পরিচ্ছন্নতা, পরিপূর্ণতা, শক্তি, অগ্রগতি, প্রতিফল ও পরিপক্কতা লাভ করে এবং অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করে। সার্বক্ষণিক আরামের

জীবন কল্যানের চেয়ে অকল্যানের বেশী নিকটবর্তী এবং ঐ দিকেউ ধাবিত হয়।

তৃতীয় কারণঃ দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষার ময়দান ও খেদমতের স্থান; আনন্দ, পারিশ্রমিক ও পুরস্কারের জায়গা নয়। যেহেতু খেদমতের স্থান এবং ইবাদতের ময়দান সেহেতু অসুস্থতা ও মুসিবত যদি দ্বীনি না হয় এবং মুমিন যদি ধৈর্য্যের পরিচয় দেয় তাহলে ঐ খেদমতে ও ইবাদতে বেশী সফল হবে এবং শক্তি অর্জন করবে। এক ঘন্টার ইবাদত এক দিনের ইবাদনের সমান হওয়ার অভিযোগ নয় বরং শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

ইবাদত দুই ধরনেরঃ মুসবত ও মানফি। মুসবত হলো যে ইবাদতগুলো আমরা সচরাচর করে থাকি। আর মানফি হলো মুসিবতগ্রস্থ কোন ব্যক্তির অসুস্থতা ও মুসিবতের দ্বারা নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বকে উপলব্ধি করে রব-ই রাহীমের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা, তাঁকে নিয়ে চিন্তা করা এবং তাঁর নিকট কাকুতি মিনতি করা। এই ইবাদতের মাঝে কোন রিয়া নেই বরং তা সম্পূর্ণ খালিস। যদি মুসিবতের পুরস্কারের কথা চিন্তা করে সবরের দ্বারা শুকরিয়া আদায় করে তাহলে তার প্রতিটি ঘন্টা এক দিনের ইবাদতের সমতুল্য হয়। স্বল্পদীর্ঘ জীবন সুদীর্ঘ জীবন সুদীর্ঘ জীবনে পরিণত হয়। এমনকি অনেক অসুখ ও মুসিবত আছে যার এক মিনিটের ইবাদত এক দিনের ইবাদতের সমান। আখিরাতের ভাই মুহাজির হাফিজ আহমেদ খুবই জটিল এক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমার কালবে সতর্কবাণী আসল, “তাকে অভিনন্দন জানাও। তার প্রতিটি মিনিট এক দিনের ইবাদতের সমতুল্য।” সে ব্যক্তিও সবরের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করে চলছিল।

তৃতীয় তাৎপর্য

দু'একটি বাণীতেও উল্লেখ করেছি মানুষ যদি তার অতীত হায়াতকে নিয়ে খুব বেশী চিন্তা করে তাহলে তার কালবে ও ভাষায় হয় 'উহ' না হয় 'আহ' আসবে। অর্থাৎ হয় দুঃখ অনুভব করে অথবা "আলহামদুলিল্লাহ" বলে।

অতীতের আনন্দঘন সময়ের সমাপ্তি ও বিদায় থেকে উদ্ভুত কষ্টই দুঃখের প্রকাশ ঘটায়। কারণ আনন্দের সমাপ্তিই হচ্ছে কষ্ট। কখনও কখনও সাময়িক আনন্দ সার্বক্ষণিক কষ্টের কারণ হয়। আনন্দঘন দিনগুলোর কথা বেশী চিন্তা করলে কষ্ট বাড়ে, দুঃখ চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে।

বিগত দিনের সাময়িক কষ্টগুলো সমাপ্তি থেকে উদ্ভুত সার্বক্ষণিক আনন্দ "আলহামদুলিল্লাহ" বলিয়ে নেয়। এই ফিরতি অবস্তার পাশাপাশি মুসিবতগুলোর ফলাফল অর্থাৎ সওয়াব ও আখেরী পুরস্কার এবং স্বল্পদীর্ঘ হায়াত মুসিবতের দ্বারা সুদীর্ঘ হায়াতে পরিণত হওয়ার কথা চিন্তা করলে সবরের চেয়ে বেশী শুকরিয়া আদায় করে। আর তখন اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ سِوَى الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ বলা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

বিখ্যাত এক বাণী আছে, "মুসিবতের সময় দীর্ঘ।" আসলেই মুসিবতের সময় দীর্ঘ কিন্তু "কষ্টকর বিধায় দীর্ঘ হয়" জনসাধারনের এ ধারনা সঠিক নয়। বরং দীর্ঘ হায়াতের প্রতিফলগুলো এ সময় পাওয়ায় তা দীর্ঘ হয়।

চতুর্থ তাৎপর্য

একুশতম বাণীর প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনানুযায়ীঃ জনাব-ই হাক প্রদত্ত সবর শক্তিতে মানুষ যদি অমূলক কিছুর পেছনে ব্যয় না করে তাহলে তা সকল মুসিবতকে মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু অমূলক ভয়ে ভীত ও গাফলতে পতিত হয়ে এবং ফানী হায়াতকে বাকী (চিরস্থায়ী) মনে করে সবর শক্তিকে অতীত ও ভবিষ্যতে ক্ষয় করায় উপস্থিত মুসিবতকে মুকাবিলা করার জন্য অবশিস্ট সবর শক্তি যথেষ্ট হয় না। অভিযোগ করতে শুরু করে। (আল lলাহ ক্ষমা করুক) জনাব-ই হাকের বিরুদ্ধে মানুষের নিকট অভিযোগ করে। অধিকন্তু খুবই অন্যায়ভাবেও পাগলের ন্যায় অভিযোগ করে সবরহীনতার পরিচয় দেয়।

অতীতের প্রতিটি দিন মুসিবতের হয়ে থাকলে তার কস্ট চলে গেছে স্বস্তি রয়ে গেছে। দুঃখ চলে গেছে বিদায়ের মাঝে বিদ্যমান আনন্দ রয়েগেছে। বেদনা চলে গেছে সওয়াব রয়ে গেছে। ফরে এ থেকে অভিযোগ নয় বরং আনন্দের সাথে শুকরিয়া আদায় করা দরকার। সেগুলোর প্রতি অস্তোষ নয় বরং মহব্বত পোষণ করা প্রয়োজন। ক্ষণস্থায়ী অতীত জীবন মুসিবতের দ্বারা এক ধরনের চিরস্থায়ী ও সুখি জীবনে পরিণত হয়। অতীত মুসিবতে বিদ্যমান দুঃখ–কষ্টগুলোকে নিয়ে অহেতুক চিন্তা করে সবরের একটা অংশকে ব্যয় করা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু ভবিষ্যত দিনগুলো যেহেতু এখনও আসেনি সেহেতু ওই সময়ে অসুস্থ হওয়া কিংবা মুসিবতের মুখোমুখি হওয়া নিয়ে এখনই চিন্তা করে সবরহীনতার পরিচয় দেয়া ও অভিযোগ করা বোকামির পরিচয়। "আগামীকাল বা পরশু অভুক্ত থাকব,

পানি পাওয়া যাবে না” বলে আজ অনবরত পানি পান ও ভাত খাওয়া যেমন নিরেট নির্বুদ্ধিতার পরিচয় তেমনি ভবিষ্যত দিনগুলোর অনাগত মুসিবত ও রোগগুলোর কথা চিন্তা করে ব্যতিত হওয়া ও সবরহীনতার পরিচয় দেয়া এবং কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া নিজের প্রতি জুলুম করা এক ধরনের বোকামির পরিচয় যা তাকে মমতা ও দয়ার অযোগ্য করে তুলে।

মোটকথা, শুকরিয়া যেমন নিয়ামতকে বৃদ্ধি করে তেমনি অভিযোগ মুসিবতকে বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে তাকে দয়ার অযোগ্য করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতম বছরে ‘এরযুরুমে’ মুবারক এক ব্যক্তি জটিল এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। আমি তার কাছে গেলাম। তিনি আমাকে অভিযোগের সুরে বলরেন, “একশত রাত দরে আমি বালিশে মাথা রেখে ঘুমাতে পারিনি।” আমি খুব ব্যতিত হলাম। হঠাৎ আমার স্মরণ হল এবং বলাল, “হে আমার ভাই! অতীতের কষ্টকর একশদিন এখন আনন্দময় একশদিনে পরিণত হয়েছে। ঐ দিনগুলোর কথা চিন্তা করে অভিযোগ করো না বরং শুকরিয়া আদায় কর। ভবিষ্যতের দিনগুলো যেহেতু এখনও আসেনি সেহেতু তোমার রব রাহমানুর রাহীমের রহমতের উপর ভরসা কর, আঘাত না পেতে্ু কেঁদনা, অস্তিত্বহীন কিছুকে ভয় করো না, অস্তিত্বহীন কিচুকে অস্তিত্ব প্রদান করো না। এই মুহুর্তটি চিন্তা কর। তোমার মাঝে বিদ্যমান সবর শক্তি এই মুহুর্তের জন্য যতেস্ট। উন্মাদ কমান্ডারের মত করো না যে কিনা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বামদিকের সৈনিকেরা তার ডানদিকের সৈনিকদের সঙ্গে যোগদান করত শক্তি বৃদ্ধি সত্ত্বেও সে তার গুরুত্বপূর্ণ সৈনিকদেরকে শত্রুর বামদিকে পাঠিয়ে কেন্দ্রকে দূর্বল করে। একই সঙ্গে বামদিকে শত্রু সৈন্য নাই এবং না আসতেই বিশাল এক সৈন্যবাহিনী সেদিকে পাঠিয়ে

গুলি করার নির্দেশ প্রদান করে। এভাবে সে কেন্দ্রের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে। শত্রু এই অবস্থা বুঝতে পেরে, কেন্দ্রে আক্রম চালিয়ে সবকিছুকে ধ্বংস করে।

আমি আরও বললাম, "হে আমার ভাই" তুমি এই কমান্ডারের মত করো না। তোমার সমস্ত শক্তি বর্তমান গাটতির জন্য ব্যয় কর। ইলাহী রহমত, আখেরী পুরস্কার এবং ক্ষণস্থায়ী হায়াতের চিরস্থায়ীত্ব লাভের কথা চিন্তা কর। এই বেদনাময় অভিযোগের পরিবর্তে স্বস্তির শুকরিয়া আদায় কর।" ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বস্তি পেয়ে "আলহামদুলিল্লাহ" বলল। অসুস্থতা দশভাগ থেকে এক ভাগে নেমে এলো।

পঞ্চম তাৎপর্য

তিনটি বিষয় রয়েছে।

প্রথম বিষয়ঃ আসল ও ক্ষতির মুসিবত হলো সেই মুসিবত যা দ্বীনের উপর আসে। দ্বীনের উপরে আসা মুসিবতের মুখোমুখি না হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করে ফরিয়াদ করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যে সব মুসিবত দ্বনের উপর আসে না সেগুলো সত্যিকার অর্থে কোন মুসিবত নয়। এদের কিয়দংশ হচ্ছে রাহমানী সতর্কতা। অন্যের ক্ষেতে মুখ দেয়ায় রাখাল ঢিল ছুড়লে মেষগুলো বুঝতে পারে যে তাদেরকে ক্ষতিকর কাজ থেকে রক্ষার জন্য এটি একটি সতর্কবাণী তখন তারা বাধা পেয়ে ফিরে আসে। ঠিক তেমনি অনেক প্রকাশ্য মুসিবত রয়েছে যেগুলো একেকটি ইলাহী সতর্কতা ও বিপদ সংকেত। মুসিবতের অনেকগুলো হচ্ছে তাফফারাতুযযুনুব (গুনাহ মাফের উসিলা)। আবার অনেক মুসিবত আছে যা গাফলতকে দূরীভূত করে। মানুষের মাঝে বিদ্যমান অসহায়ত্ব ও দুর্বলতাকে স্মরণ করানোর মাধ্যমে তাকে এক অর্থে শান্তি প্রদান করে।

অসুস্থতা নামক মুসিবত উপরোল্লেখিত মুসিবতগুলোর মত নয় বরং তা হচ্ছ পরিচ্ছন্নতা ও ইলতিফাত-ই রাব্বানীয়া (ইলাহী রহমত) লাভের উপায়। রিওয়ায়েত আছেঃ "ফলে পরিপূর্ণ গাছকে ঝাঁকালে যেমন ফলগুলো ঝরে পড়তে থাকে তেমনি ম্যালেরিয়ার কাপুনি থেকে গুনাহগুলো ঝড়তে থাকে।

হযরত আইয়ুব (আঃ) নিজের আরাম আয়েমের জন্য দোয়া করেননি বরং অসুস্থতা যিকির এবং অন্তরের দ্বারা তাফাক্কুরের প্রতিবন্ধক হওয়ায় ইবাদতের জন্য আল্লাহর নিকট শিফা চেয়েছেন। এই মুনাজাতের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল গুনাহগুলো থেকে উদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও রূহানী ক্ষতগুলোর জন্য শিফা লাভ।

অসুস্থতা ইবাদতের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ালে আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি কিন্তু বিদ্রোহ ও অভিযোগের সুরে নয় বরং নম্রভাবে ও সাহায্যের আশায় আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার। আমরা যেহেতু তাঁর রুবুরিয়াতকে গ্রহন করেছি সেহেতু রব কর্তৃক প্রদত্ত কিছুকে অভিযোগহীনভাবে গ্রহন করা দরকার।

তাকদীর ও কদরের বিরোধিতাকে উজ্জীবিত করার মত 'আহ' 'উহ' করে অভিযোগ করা কদরের সমালোচনা ও আল্লাহর রাহীমিয়াতের বিরুদ্ধাচরনের শামিল। কদরের সমালোচনাকারী নিজ মাথাকে লৌহদন্ডে আঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করে। রহমতকে কটাক্ষকারী রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভাঙ্গা হাতের ব্যবহারে সেই হাত যেমন আরো ভেঙ্গে যায় তেমনি মুসিবতে আক্রান্ত ব্যক্তি বিরোধিতার সুরে অভিযোগ ও উদ্বেগের দ্বারা মুসিবতকে গ্রহন করায় তা দ্বিগুণ হয়।

দ্বিতীয় বিষয়

মুসিবতগুলোকে বড় করে দেখলে তা বড় হতে থাকে্ আর ছোট করে দেখলে তা ছোট হতে থাকে। যেমন, রাতের বেলায় মানুষ কোন কিছুর ছায়া দেখে তাকে গুরুত্ব দিলে তা বড় হতে থাকে কিন্তু গুরুত্ব না দিলে তা হারিয়ে যায়। আক্রমণকারী মৌমাছিগুলোকে দাওয়া করলে সেগুলো আরও বেশী আক্রমনাত্মক হয়। আর চুপ থাকলে চলে যায়। ঠিক একইভাবে মুসিবতগুলোকে খুব বড় করে দেখলে তা বড় হতে থাকে। উদ্বেগের কারণে ঐ মুসিবত দেহ থেকে কালবে প্রসারিত হয়। ফলশ্রুতিতে মানসিক এক মুসিবতের আবির্ভাব ঘটে। আসল মুসিবত মানসিক মুসিবতের উপর ভর করে চলতে থাকে।

ভাগ্যকে মেনে নিয়ে এবং তাওয়াক্কুলের দ্বারা উদ্বেগকে দূরীভূত করলে মুসিবত হালকা হতে হতে শিকড়সহ উপড়ে ফেলা গাছের মত শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এই হাকিকাত ফুটিয়ে তুলতে কোন এক সময় বলেছিলাম।

“হে উপায়হীন! ফরিয়াদ করা থেকে বিরত থাক,

বালা মুসিবতে তাওয়াক্কুল কর।

জেনে রেখ, ফরিয়াদ, মুসিবত ও ভ্রান্তির মাঝে
এক বালা মুসিবত।

যদি তুমি বালা প্রদানকারীকে খুঁজে পেয়ে থাক

তাহলে বালা, শান্তি ও আরামের মাঝে বরকত ও লুতুফ।

যেখানে দুনিয়া সমপরিমান বালা মুসিবত রয়ে গেছে সেখানে

ছোট একটি মুসিবতের মুখোমুখি হয়ে কেন চিৎকার করছ,

আস তাওয়াক্কুল কর।

তাওয়াক্কুলের মাঝে হাসিমুখে বালা মুসিবতকে গ্রহন কর

যাতে সেও হাসে।

সে হাসলে ছোট হতে থাকে, পরিবর্তিত হয়ে যায়।"

তীব্র যুদ্ধে কঠিন শত্রুকে হাসির দ্বারা গ্রহণ করলে শত্রুতা শান্তিতে, হিংসা ঠাট্টায় পরিণত হয়। শত্রুতা ছোট হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাওয়াক্কুলের দ্বারা মুসিবতের সাথে সংগ্রাম করলে সেটিও একই পরিণতির মুখোমুখি হবে।

তৃতীয় বিষয়ঃ সকল সময়ের এক ধরনের প্রতিফলন আছে। গাফলতের এই সময়ে মুসিবত তার রূপ পরিবর্তন করেছে। কোন কোন সময় এবং কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বালা বালা নয় বরং তা ইলাহী লুতুফ (ইলাহী দয়া)। এই সময়ে মুসিবতগ্রস্থদেরকে সৌভাগ্যবান হিসেবে দেখার কারণে অসুস্থতা ও মুসিবতের বিরোধিতা করা আমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে এবং আমার মাঝে তাদের জন্য কোন ধরনের দুঃখবোধেরও উদয় হচ্ছে না। কারণ, যখনই কোন অসুস্থ যুবক আমার নিকট এসেছে তখনই দেখেছি তার সমবয়সীদের তুলনায় সে এক অর্থে আখিরাত ও দ্বীনি দায়িত্বগুলোর প্রতি আরো বেশী আগ্রহী। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অসুস্থতা ঐ যুবকের জন্য মুসিবত নয় বরং তা একধরনের ইলাহী নিয়ামত। ঐ অসুস্থতা তার দুনিয়াবী, ক্ষণস্থায়ী এবং স্বল্পক্ষণের হায়াতকে কষ্টকর করে তুলে কিন্তু চিরন্তন হায়াতের জন্য তা খুবই উপকারী। আসলে তা এক ধরনের ইবাদতে পরিণত হয়। আরোগ্য লাভ করলে যৌবনের তাড়নায় এবং যামানার অবৈধ ভোগ বিলাসের আকর্ষণে অসুস্থকালীন পরিচ্ছন্নতাকে ধরে রাখতে পারে না। হয়ত অবৈধ ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়।